আগস্ট ২০২৩

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৬তম সংখ্যা

বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন

নিরীক্ষা

২৪৬তম সংখ্যা: আগস্ট ২০২৩

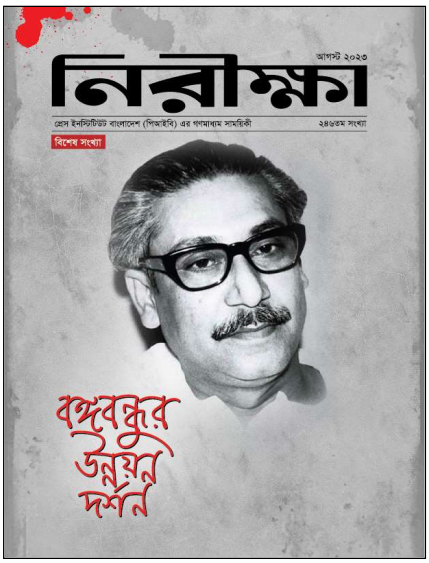

আগস্ট বাঙালির শোকাবহ বেদনাবিধুর মাস। এ শোক এতই বিশাল ও কষ্টের যে-এর ভার বহনও দুঃসহ। ১৫ আগস্ট বাঙালি হারিয়েছে তার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শুধু জাতির পিতাকে নয়, ১৯৭৫ সালে এদিন কালরাত্রিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের বিরোধী, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতপুষ্ট ঘাতকরা ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে নির্মমভাবে হত্যা করে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল, রোজী জামাল, শেখ আবু নাসের-সহ ১৮ জনকে। বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

ইতিহাসের নৃশংসতম এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করার জন্য খুনি মোশতাক জারি করে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। এ হত্যাকাণ্ডের বেনিফিশিয়ারি সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। পরে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে চাকরি দিয়ে ঘাতকদের পুরস্কৃত করা, স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী করা, একাত্তরের ঘাতক আবদুল আলীমসহ রাজাকার-আলবদরদের মন্ত্রী করা, গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে এনে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা–এমন অনেক ঘটনাই প্রমাণ করে পঁচাত্তরের ষড়যন্ত্রে কারা যুক্ত ছিল।

পঁচাত্তরের ঘাতকচক্র এবং তাদের দোসররা শুধু ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই হত্যা করেনি; বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িকতাও মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু কালের পরিক্রমায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এখন তাঁরই আত্মজার নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশও প্রত্যাবর্তন করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায়। একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বহুলাংশে সম্পন্ন হয়েছে; আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নও সম্ভব হচ্ছে। এককথায়–বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন তথা স্বপ্নের বাংলাদেশ আজ বাস্তবতায়। সহজ করে বললে, খোদ বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন।

স্বস্তির যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ছয় ঘাতকের শাস্তি কার্যকর হয়েছে। পাঁচজন এখনো পলাতক। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থান শনাক্ত হলেও তিনজন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে খুনিরা দৈহিকভাবে বেঁচে থাকলেও তাদের আত্মগোপনে যাপিত জীবন সামাজিকভাবেই মৃত্যুতুল্য। একসময় যারা বুক ফুলিয়ে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করত, তারা আজ ভিন্ন রাষ্ট্রের অনুগ্রহে এক নিগৃহীত জীবন কাটাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করলে প্রচলিত আইনে হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়। বিচারিক প্রক্রিয়ায়ও উঠে আসে ষড়যন্ত্রের নানা দিক।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ঘটনায় 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী এবং মদতদাতাদের' চিহ্নিত করে বিচারের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি 'কমিশন' গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। আমরা চাই দ্রুত সেই দাবি বাস্তবায়িত হোক। ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া জরুরি। কারণ, ষড়যন্ত্র এখনো চলছে, হয়তো চলতেই থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের সব ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে মোকাবিলা করার দৃপ্ত শপথ নেওয়ার এখনই সময়।

নিরীক্ষার জাতীয় শোক দিবস সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে সরকারপ্রধান হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের উন্নয়নদর্শন নিয়ে। লেখক ও গবেষকরা মূল্যায়ন করেছেন বঙ্গবন্ধু সরকারের। রয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন-এর এক সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার–যাতে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা স্মৃতিচারণা। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি সাংবাদিক, গবেষক ও পাঠকদের জন্য মূল্যবান প্রতীয়মান হবে বলে বিশ্বাস। জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুসহ সব শহিদানের প্রতি অতলশ্রদ্ধা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

ISBN: 978-984-35-4812-2

সূচিপত্র

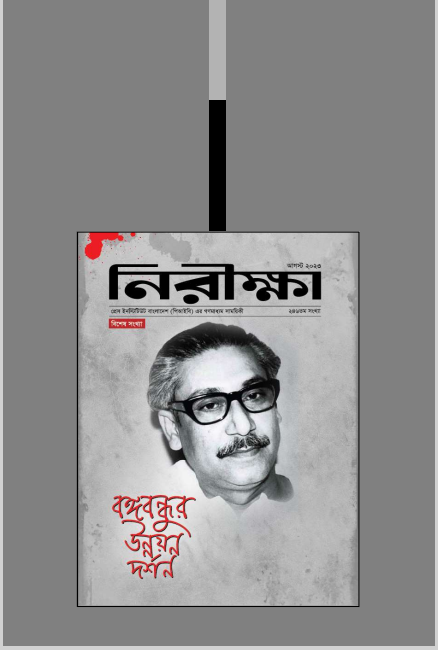

বেদনায় ভরা দিন ৫
শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ভাবনা ও তা বাস্তবায়ন ৯
ড. শামসুল আলম

স্মার্ট বাংলাদেশের বীজ বঙ্গবন্ধু বপন করেছেন ১২
মোস্তাফা জব্বার

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা ১৬
ড. আরএম দেবনাথ

বঙ্গবন্ধুর প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা ১৯
মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আলী শিকদার

বঙ্গবন্ধুর অবদানে কতটুকু এগিয়েছে আমাদের ওষুধশিল্প ২২
অধ্যাপক আ ব ম ফারুক

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সফলতা ২৫
একেএম আতিকুর রহমান

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৩০
মোস্তফা হোসেইন

বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভাবনা ৩৫
ড. মো. নাছিম আখতার

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মরতে পারলাম না —মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ৩৭
বনশ্রী ডলি

৪৬ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক
আলী হাবিব

৫০ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা
ড. মিল্টন বিশ্বাস

৫৬ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে!
পাভেল রহমান

৫৯ বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যভাবনা
অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

৬১ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ছিল নিষিদ্ধ সংবাদ
জুলফিকার আলি মাণিক

৬৪ স্মার্ট কৃষি গড়তে বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা
নিরঞ্জন রায়

৬৮ ইসলামি চেতনায় সমুজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু
মো. জাকির হোসেন

৭২ বঙ্গবন্ধুর তিনটি গ্রন্থ এবং নতুন প্রজন্মের বহুমাত্রিক চেতনা
সালাম জুবায়ের

৭৬ বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র
জাফর ওয়াজেদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা পেতে: প্রকাশনা কর্মকর্তা পিআইবি, বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম
অনলাইনে: www.rokomari.com

মূল্য ৫০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩

"যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত,
কেউ তাকে মারতে পারে না"

—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বেদনায় ভরা দিন

শেখ হাসিনা

রোড ৩২, ধানমন্ডি।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। এমন সময় প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। এ গোলাগুলির আওয়াজ ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ি ঘিরে, যে বাড়িতে বসবাস করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক বিঘা জমির ওপর খুবই সাধারণ মানের ছোট্ট একটা বাড়ি। মধ্যবিত্ত মানুষের মতোই সেখানে বসবাস করেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সব সময়ই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এ বাড়ি থেকেই ১৯৭১ সালের ২৬-এ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের যে আন্দোলন-সংগ্রাম–এই বাড়িটি তার নীরব সাক্ষী। সেই বাড়িটিই হলো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে আজানের ধ্বনি হারিয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নিরাপত্তায় সাধারণত সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ১০-১২ দিন আগে বেঙ্গল ল্যান্সারের অফিসার ও সৈনিকদের এ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার মা, বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব লক্ষ করলেন কালো পোশাকধারী সৈনিকরা বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত। তিনি প্রশ্নটা তুলেছিলেনও। কিন্তু কোনো সদুত্তর পাননি।

আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছিল দেশের মানুষের প্রতি অঢেল ভালোবাসা। তিনি সবাইকেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনো এটা ভাবতেও পারেননি যে, কোনো বাঙালি তাঁর ওপর গুলি চালাতে পারে বা তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাঁকে বাঙালি কখনো মারবে না, ক্ষতি করবে না–এ বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই বিশ্বাসের কি মূল্য তিনি পেয়েছিলেন?

চারদিকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ। বিকট শব্দে মেশিনগান থেকে গুলি করতে করতে মিলিটারি গাড়ি এসে দাঁড়াল ৩২ নম্বর রোডের বাড়ির সামনে। গুলির আওয়াজে ততক্ষণে বাড়ির

সবাই জেগে উঠেছে। আমার ভাই শেখ কামাল দ্রুত নিচে নেমে গেল রিসিপশন রুমে, কারা আক্রমণ করল, কী ঘটনা জানতে। বাবার ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছিলেন না।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কামাল বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখে বাড়ির গেট দিয়ে মেজর নূর ও ক্যাপ্টেন হুদা এগিয়ে আসছে। কামাল তাদের দেখেই বলতে শুরু করল: আপনারা এসে গেছেন, দেখেন তো কারা বাড়ি আক্রমণ করল?

ওর কথা শেষ হতে পারল না। তাদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল। কামাল সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর নূর আর কামাল একই সঙ্গে কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে। আর সেই কারণে ওরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনত। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সেই চেনা মানুষগুলো কেমন অচেনা ঘাতকের চেহারায় আবির্ভূত হলো। নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করল সহযোদ্ধা কামালকে। কামাল তো মুক্তিযোদ্ধা। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যায় যুদ্ধ করতে। এরপর বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসাবে।

মেজর সৈয়দ ফারুক ট্যাংক নিয়ে আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। আব্বা সবার আগে ঘর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাহ সাহেবকে ফোন করেন। তাঁকে জানান বাড়ি আক্রান্ত। তিনি জবাব দেন: আমি দেখছি। আপনি পারলে বাইরে কোথাও চলে যান।

এর মধ্যে ফোন বেজে ওঠে। কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, আমার সেজো ফুপা, ফোনে জানান যে তাঁর বাড়ি কারা যেন আক্রমণ করেছে। আব্বা জবাব দেন তাঁর বাড়িও আক্রান্ত। আব্বা আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ফোন করেন। আবদুর রাজ্জাক বলেন, লিডার দেখি কী করা যায়। আবদুর রাজ্জাক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তোফায়েল আহমেদ ফোনে বলেন, আমি দেখছি। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বলতে থাকেন, আমি কী করব? তোফায়েল আহমেদ রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। আব্বা নিচে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হন। মা পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দেন। আব্বা যেতে যেতে কামাল কোথায় জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কথা বলতে বলতে তিনি সিঁড়ির কাছে পৌঁছান।

এ সময় সিঁড়ির মাঝের প্ল্যাটফরমে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও দোতলায় উঠে আসছিল। এদের মধ্যে হুদাকে চিনতে পারেন আব্বা। আব্বা তার বাবার নাম ধরে বলেন, তুমি রিয়াজের ছেলে না? কী চাস তোরা? কথা শেষ করতে না করতেই গর্জে উঠে ওদের হাতের অস্ত্র। তাদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই যোগ দিয়েছিল রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন।

ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়লেন আব্বা। আমার মা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘাতকের দল ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। আমার মাকে তারা বাধা দিল এবং বলল যে আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন। মা বললেন, আমি এক পাও নড়ব না, কোথাও যাব না। তোমরা ওনাকে মারলে কেন? আমাকেও মেরে ফেল। ঘাতকদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল। আমার মা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল ও জামালের স্ত্রী রোজী জামাল মায়ের ঘরে ছিল। সেখানেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করে ঘাতকরা। রাসেলকে রমা জড়িয়ে ধরে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ছোট্ট রাসেল কিছুই বুঝতে পারছে না। একজন সৈনিক রাসেল আর রমাকে ধরে নিচের তলায় নিয়ে যায়। একই সঙ্গে বাড়িতে আরও যারা ছিল, তাদেরও নিচে নিয়ে দাঁড় করায়।

গৃহকর্মী আব্দুল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাকেও নিয়ে যায়। বাড়ির সামনে আমগাছতলায় সবাইকে দাঁড় করিয়ে একে একে পরিচয় জিজ্ঞেস করে। আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের পঙ্গু ছিলেন। তিনি বারবার মিনতি করছিলেন, আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা; আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমাকে মেরো না। ছোটো ছোটো বাচ্চা আমার, ওদের কী হবে? কিন্তু খুনিরা কোনো কথাই কানে নেয় না। তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে অফিস ঘরের বাথরুমে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

রমার হাত ধরে রাসেল "মা'র কাছে যাব, মা'র কাছে যাব" বলে কান্নাকাটি করছিল। রমা বারবার ওকে বোঝাচ্ছিল, তুমি কেঁদো না ভাই। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু অবুঝ শিশু মায়ের কাছে যাব বলে কেঁদেই চলছে। এ সময় একজন পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় পেয়ে বলে, চলো, তোমাকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

ভাইয়ের লাশ, বাবার লাশ মাড়িয়ে রাসেলকে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে মায়ের লাশের পাশেই গুলি করে হত্যা করে। ১০ বছরের ছোট্ট শিশুটাকে ঘাতকের দল বাঁচতে দিল না।

যে বাড়ি থেকে একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি রক্তে ভেসে গেল। সেই রক্তের ধারা ওই সিঁড়ি বেয়ে বাংলার মাটিতে মিশে গেছে–যে মাটির মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

৪৬ ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন সাফায়েত জামিল। সেনাপ্রধান তাঁকে ফোন করে পায়নি। সিজিএস খালেদ মোশাররফও কোনো দায়িত্ব পালন করেনি। সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেনি বরং সে পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। খুনি রশীদ ও ফারুক বিবিসিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার কথা বলেছে। খুনি মোশতাক জিয়াকে সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়োগ দেয়। ঢাকার তৎকালীন এসপি মাহবুবকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি।

মেজো ফুপুর বাসা

ঘাতকরা ধানমন্ডির মেজো ফুপুর বাড়ি আক্রমণ করে রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের নেতৃত্বে। তাদের একটি দল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে গালি দিতে থাকে। বুটের আওয়াজ আর চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা এবং 'বাংলার বাণীর' সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বন্দুক তাক করে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে ঘাতকের দল। এ সময় তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু ছুটে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ঘাতকদের বুলেট থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ঘাতকের দল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে। বুলেটের আঘাতে দুজনের শরীর ঝাঁজরা হয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিথর দেহ দুটি। ছোটো দুই ছেলে, তিন বছরের তাপস আর বছর পাঁচেকের পরশ, মা-বাবার লাশের পাশে এসে চিৎকার করতে থাকে আর বলতে থাকে–মা ওঠো, বাবা ওঠো। ওই শিশুদের কান্না মা-বাবা কি শুনতে পেয়েছিল? ততক্ষণে তাঁরা তো না-ফেরার দেশে চলে গেছে। শিশুদের চোখের পানি মা-বাবার রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সেজো ফুপুর বাড়ি

গুলি করতে করতে মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মেজর এএম রাশেদ চৌধুরী মিন্টু রোডে সেজো ফুপার সরকারি বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায়। পরিবারের সব সদস্যকে তাঁদের ঘর থেকে বের করে নিচতলায় বসার ঘরে নিয়ে আসে। এরপর তাদের ওপর বার্স্ট ফায়ার করে। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন ফুপু আমিনা

আমার আব্বা কোনোদিন বিশ্বাস করতেই পারতেন না যে, বাংলাদেশের কোনো মানুষ তাঁকে মারতে পারে বা কোনো ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীর অনেক নেতাই তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, ওরা তো আমার ছেলে, আমাকে কেন মারবে?

সেরনিয়াবাত, ফুপা কৃষিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বিউটি, বেবি, রিনা, ছেলে খোকন, আরিফ, বড়ো ছেলে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর স্ত্রী শাহানা, নাতি সুকান্ত, ভাইয়ের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও ভাগনে রেন্টু। আট বছরের নাতনি কান্তা গুলিবিদ্ধ লাশের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়। দেড় বছরের নাতি সাদেক গুলিবিদ্ধ মায়ের বুকে পড়ে কাঁদতে থাকে। আট বছরের কান্তা নিজের ফুপু বেবির লাশের নিচে চাপা পড়েছিল। সেখান থেকে কোনো মতে বের হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সারি সারি গুলিবিদ্ধ আপনজন পড়ে আছে। কারও নিথর দেহ, কেউ বা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ঘরের কোনায় রাখা অ্যাকুরিয়াম গুলি লেগে ভেঙে যায়। অ্যাকুরিয়ামের পানির সঙ্গে মাছগুলো মাটিতে পড়ে যায়। রক্তভেজা পানিতে মাছগুলোও ছটফট করে লাফাতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে যে আপনজন মা, বাবা, দাদা-দাদি, চাচা, ফুপুসহ সবাইকে নিয়ে এই শিশুরা ছিল, আর এখন গুলিবিদ্ধ রক্তে ভেজা আপনজন। লাশের নিচ থেকে নিজেকে বের করে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ৮ বছরের শিশুটি অবাক বিস্ময়ে ভীতসন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মেজর ফারুক ট্যাংক নিয়ে লেকের ওপার থেকে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবন লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। সেই গুলি মোহাম্মদপুরে এক বাড়িতে পড়ে। সেখানে ১১ জন মানুষ নিহত হয় আরও অনেকেই আহত হয়। মেজর ডালিম রেডিয়ো স্টেশন দখলের দায়িত্বে ছিল। সেখান থেকেই সে ঘোষণা দেয়–শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকেরা শুধু হত্যা করে তাই নয়, তারা আমাদের বাসা লুটপাট করে। আমার বাবার শোয়ার ঘরে এবং ড্রেসিং রুমের সব আলমারি, লকার–সবকিছু ভেঙে সেখান থেকে যা কিছু মূল্যবান ছিল–গহনা, ঘড়ি, টাকাপয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়। বাসায় ব্যবহার করা গাড়িটাও মেজর হুদা ও নূর নিয়ে যায়।

আলমারির সব কাপড়চোপড় বিছানার ওপর পড়েছিল। সেগুলোর অনেকগুলোয় ছিল রক্তের দাগ। এই হত্যাকাণ্ডের পর লুটপাটের ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ওদের চরিত্রের অন্ধকার দিকটা। এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারা এই সদ্যস্বাধীন দেশের মানুষের কত বড়ো সর্বনাশ করেছিল, তা কি ওরা বুঝতে পেরেছিল?

যে বুকে বাংলার মানুষের জন্য প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল, সেই বুকটাই ঝাঁজরা করে দিল তাঁরই প্রিয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কিছু দুর্বৃত্ত। আমার আব্বা কোনোদিন বিশ্বাস করতেই পারতেন না যে, বাংলাদেশের কোনো মানুষ তাঁকে মারতে পারে বা কোনো ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীর অনেক নেতাই তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, ওরা তো আমার ছেলে, আমাকে কেন মারবে? এত বড়ো বিশ্বাস ভঙ্গ করে ওরা বাঙালির ললাটে কলঙ্ক লেপন করল।

কী বিচিত্র এ দেশ! একদিন যে মানুষটির একটি ডাকে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় এনেছিল, বীরের জাতি হিসাবে সারা বিশ্বের কাছে মর্যাদা পেয়েছিল, আজ এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেই জাতি সমগ্র বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতক জাতি হিসাবে পরিচিতি পায়। খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের এদেশের অগণিত জনগণ ঘৃণা করে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করে।

আমার অন্তঃসত্ত্বা চাচি ছয় সন্তান নিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হন। খুলনায় ভাড়ার বাসায় বসবাস করতেন। সে বাসা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। টুঙ্গিপাড়ার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। ঘরবাড়িহারা সদ্যবিধবা কোথায় ঠাঁই পাবেন?

সোবহানবাগ

আব্বার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। সোবহানবাগ মসজিদের কাছে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় ঘাতকেরা। তিনি এগোতে চাইলে ঘাতকেরা তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে।

আমাদের বাড়ির নিচে পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্য এসআই সিদ্দিকুর রহমানকেও তারা গুলি করে হত্যা করে।

বেলজিয়াম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ...। টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো টেলিফোনের আওয়াজ এত কর্কশ? আমি ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। দেখি নিচে অ্যাম্বাসেডর সানাউল হক সাহেব ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ওয়াজেদের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। অপর প্রান্তে জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশীদ সাহেব কথা বলছেন। তিনি জানালেন বাংলাদেশে ক্যু হয়েছে। আমার মুখ থেকে বের হলো: 'তাহলে তো আমাদের আর কেউ বেঁচে নাই।' রেহানা পাশে ছিল। তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু তখনও জানি না কী ঘটনা ঘটেছে।

মাত্র ১৫ দিন আগে জার্মানি এসেছি। বেলজিয়ামে বেড়াতে এসেছি। নেদারল্যান্ডসেও গিয়েছিলাম। আব্বা বলেছিলেন, 'নেদারল্যান্ডস কীভাবে সাগর থেকে ভূমি উত্তোলন করে, পারলে একবার দেখে এসো।' একদিন আগেই আব্বা-মা'র সঙ্গে কথা হয়েছে। কেন জানি মা খুব কাঁদছিলেন। বললেন, 'তোর সাথে আমার অনেক

কথা আছে, তুই আসলে আমি বলবো।' আমাদের খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল তখনই দেশে ছুটে চলে যাই।

আব্বা বললেন, রোমানিয়া ও বুলগেরিয়াতে তিনি যাবেন। আর ফেরার পথে আমাদের নিয়ে আসবেন।

কিন্তু আমাদের আর দেশে ফেরা হলো না। একদিন পরই সব শেষ। বেলজিয়ামের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হক, যিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছায় অ্যাম্বাসেডর পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন, রাতারাতি তার চেহারাটাই পালটে গেল। তিনি জার্মানিতে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ সাহেবকে বলেন, যে বিপদ আমার কাঁধে পাঠিয়েছেন, তাঁদের ফেরত নেন।

যিনি আগের রাতে আমাদের জন্য 'ক্যান্ডেল লাইট ডিনার'-এর আয়োজন করেছিলেন; কত খাতির, আদর-যত্ন, আর এখন আমরা তার কাছে আপদ হয়ে গেলাম। আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িটাও দিলেন না। বেলজিয়াম অ্যাম্বাসিতে কর্মরত আমার স্কুলের বান্ধবী নমির স্বামী জাহাঙ্গীর সাদাতের গাড়িতে করে আমাদের বেলজিয়াম বর্ডারে যেতে বললেন। জাহাঙ্গীর সাদাত আমাদের জার্মানির বর্ডারে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে হেঁটে নোম্যান্স ল্যান্ড পার হয়ে আমরা জার্মানির মাটিতে পৌঁছলাম। জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশীদ সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন। আর তাঁর স্ত্রী আমার বাচ্চাদের জন্য শুকনো খাবারদাবারও গাড়িতে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে কয়েকদিন আশ্রয় পেলাম। তাঁদের আদর-যত্ন দুঃসময়ে আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান। আমরা কোনোদিন ভুলতে পারব না হুমায়ুন রশীদ ও তাঁর স্ত্রীর অবদান। জার্মান অ্যাম্বাসির সব অফিসার ও কর্মচারী আমাদের অত্যন্ত যত্ন করেছিলেন। অ্যাম্বাসির গাড়িতে আমাদের কার্লস রুয়ে পৌঁছে দিলেন। জার্মানি সরকার, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ আরও অনেকে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চাইলেন। জার্মানিতে নিযুক্ত ভারতের অ্যাম্বাসেডর জনাব হুমায়ুন রশীদও ডক্টর ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের ভারতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন। আমরা জার্মানি থেকে ভারতে পৌঁছালাম।

উপসংহার

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত বেদনার আঘাত বুকে ধারণ করে আমার পথচলা। বাবা-মা-ভাইদের হারিয়ে ৬ বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি–যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, তা ব্যর্থ হতে পারে না। লাখো শহিদের রক্ত আর আমার বাবা-মা-ভাইদের রক্ত ব্যর্থ হতে আমি দেব না।

আমার চলার পথ খুব সহজ ছিল না, বারবার আমার ওপর আঘাত এসেছে। মিথ্যা অপপ্রচার, গুলি, বোমা ও গ্রেনেড হামলার শিকার হতে হয়েছে আমাকে। খুনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময় বলেছিল, 'শত বছরেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারবে না। শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, বিরোধী দলের নেতাও কখনো হতে পারবে না।' এর পরেই তো সেই ভয়াবহ ২০০৪ সালের ২১-এ আগস্টের গ্রেনেড হামলা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানবঢাল রচনা করে সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন। ওপরে আল্লাহ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আর বাংলাদেশের জনগণই আমার শক্তি। আমার চলার কণ্টকাকীর্ণ পথে এরাই আমাকে সাহায্য করে চলেছেন। তাই আজকের বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের জনগণকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি দিতে পেরেছি। তারা এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

বাবা! তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার আশীর্বাদের হাত আমার মাথার ওপর আছে, আমি তা অনুভব করতে পারি। তোমার স্বপ্ন বাংলাদেশের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যবস্থা করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব। তোমার দেশের মানুষ তোমার গভীর ভালোবাসা পেয়েছে আর এই ভালোবাসার শক্তিই হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

লেখক: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা

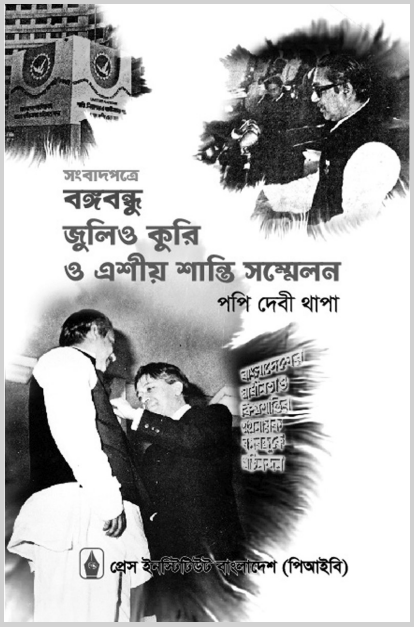

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ভাবনা ও তা বাস্তবায়ন

ড. শামসুল আলম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে ১০ জানুয়ারি মুক্ত স্বদেশভূমিতে পা রাখেন। জনতার ঢল সেদিন নেমেছিল তেজগাঁও বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। বঙ্গবন্ধু সেই সময়ের রেসকোর্স ময়দানে এসে লাখো-কোটি জনতার সমুদ্রে আবেগঘন বক্তব্য দেন মুক্ত স্বদেশভূমিতে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাঁরা দেশকে মুক্ত করেছেন, যাঁরা অংশ নিয়েছেন স্বাধীনতাসংগ্রামে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্মরণ করেছেন শহিদদের, নির্যাতিতদের এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে সহযোগী আন্তর্জাতিক শক্তি ও সমর্থনকারী নাগরিক শ্রেণির প্রতি। দেশকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন দৃঢ়কণ্ঠে।

বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফেরেন, সরকারি কোষাগার ছিল শূন্য। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ব পাকিস্তান শাখায় যেসব কাগুজে টাকা ছিল, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্বাহ্নে ব্যাংকের সামনে তা পুড়িয়ে দেয়, মুদ্রাসহ মূল্যবান রত্নরাজি লুট করে নিয়ে যায়। এরকম কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম শুরু করে।

দায়িত্ব গ্রহণ করেই বঙ্গবন্ধু দেখেন মাত্র ৯ মাস যুদ্ধে বাংলার জনপদের, জনগণের যে ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন করা হয়েছে, তা অভূতপূর্ব। বিশ্বযুদ্ধের সময়ও কোনো দেশের শত্রুপক্ষ এমনভাবে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি। নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, সর্বত্রই ধ্বংসযজ্ঞের বিশৃঙ্খল স্তূপ। নামমাত্র যে শিল্পকারখানা ছিল, পাকিস্তানিরা ফেলে পালিয়েছে, সশস্ত্র যুদ্ধের ৯ মাসে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত, এক কোটির বেশি দেশে ফেরত শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় কিংবা তাঁদের ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ায় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাত্তরের

শেষে তেমন ফসল-ফলাদি ঘরে তোলা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে সব বয়সি মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের সহায়তাদানকারীরা বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরেন। লাখো অস্ত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যত্রতত্র। রাস্তা-সড়ক জনপথ, ব্রিজ-কালভার্ট জনযুদ্ধের কৌশলে সবই ধ্বংস করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ভান্ডার শূন্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তহবিল শূন্য করা, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা, খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দেওয়া, কৃষিব্যবস্থা ভেঙে ফেলা, পণ্য সরবরাহব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া–এসব ছিল বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পিত প্রয়াস। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেখা দিল প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাঁড় করানোর অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ। দু-তিনটি দেশ ছাড়া নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি মেলেনি তখনও। আমলাতন্ত্র দাঁড় করানোর চ্যালেঞ্জ, বাণিজ্য অবকাঠামো নেই।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা করে বিশ্বজুড়ে অনেকেই উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫০ লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারাবে, দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। ১৯৭২ সালেই স্বাধীন দেশে দুর্ভিক্ষ হবে–এমন পূর্বাভাস দিয়েছিল অক্সফাম, বিশ্বব্যাংক, ইউএসএআইডি ও জাতিসংঘ। তাদের যুক্তি ছিল পাকিস্তানিদের দেশব্যাপী অভিযানের কারণে বহু কৃষক ফসল বুনতে পারেনি। ধান বুনলেও গ্রামচ্যুত কিংবা দেশান্তরী হওয়ার কারণে ফসল কর্তন করতে পারেনি। বীজ, সার, অন্যান্য উপকরণ সময়মতো বণ্টিত হয়নি বাজারব্যবস্থা ভেঙে পড়ায়। তবে যা উল্লেখ করার মতো তা হলো, ১৯৭২ সালে কাহাত বা দুর্ভিক্ষ হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠনের পরপরই অনেক গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, যার মধ্যে ছিল, ১৯৭১ সালে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া লাখ লাখ শরণার্থীর পুনর্বাসন, খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ সরবরাহ। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, বিশেষ করে অধিক ফসল উৎপাদন, সেই সঙ্গে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কৃষক যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে পারেন, সেদিকে বঙ্গবন্ধুর সুদৃষ্টি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষিই যেহেতু এ দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস, সেহেতু কৃষির উন্নতিই হবে দেশের উন্নতি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মনে করতেন, এসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বাংলার মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং বেকারত্ব দূর হবে। এজন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবকশ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

সদ্য স্বাধীনতা-উত্তর প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিশৃঙ্খল অসংগঠিত পরিবেশে বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী ও সাহসী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ২১ দিনের মাথায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপক প্রফেসর নুরুল ইসলামকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রথম সদস্য হিসাবে নিয়োগ দেন।

প্রফেসর নুরুল ইসলামের সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনে আরও তিনজনকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তাঁরা হলেন প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান ও প্রফেসর মোশাররফ হোসেন। প্রফেসর নুরুল ইসলাম ২১ দফার অর্থনৈতিক দফাগুলো প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুকে সহায়তা করেছিলেন। প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান পাকিস্তানে উন্নয়নের দিক থেকে দুই অর্থনীতির দেশ–এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন। ১৯৬৬তে লাহোরে ঘোষিত ছয় দফার মূল ভিত্তিই ছিল পাকিস্তান দুই অর্থনীতির দেশ। অর্থনৈতিক কাঠামো, কৃষি ভিত্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনা ধরন এবং খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দুই পাকিস্তানে দুই রকম। বিভিন্ন সময়ে চারজনই বাংলাদেশের ওপর শোষণ-বঞ্চনার বিষয়ে নিবন্ধ প্রণয়ন ও নাগরিক সমাজে বক্তব্য রেখে বাঙালি জাতীয়বাদের উন্মেষে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন।

দেশকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার ভাবনা থেকেই বঙ্গবন্ধু উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপনে এত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, স্বাধীন ভারতে সর্ব প্রভাবশালী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সরকার ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন তাদের স্বাধীনতার তিন বছর পর ১৯৫০ সালে এবং পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতার ছয় বছর পর ১৯৫৩ সালে। পরিকল্পনাভিত্তিক দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন একেবারে শুরুতেই।

স্বাধীনতার সেই শুরুর বছরগুলোয়ই বঙ্গবন্ধু শিক্ষা সংস্কারের কাজেও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা সংস্কার ও আধুনিকায়নে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষককে সরকারি বেতনভুক্ত করেন।

একটা স্বাধীন দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার ৯ মাসের মধ্যে একটি সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন করেছেন, সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে পেরেছিলেন, যেখানে যুদ্ধে অংশ নেওয়া কোনো মিত্রবাহিনী কখনো নিজ দেশে পুরোপুরি ফিরে যায় না। শুধু পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠাই নয়, উন্নয়ন সহায়ক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বঙ্গবন্ধুর সরকার তিন বছর সাত মাস সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আণবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিআরডিবি প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, নিজস্ব পতাকাবাহী বিমান সংস্থা, শিপিং করপোরেশন এবং সশস্ত্রবাহিনীর তিনটি অংশের জন্যই ঢাকায় সদর দপ্তর স্থাপন করেন। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের মার্চে জাতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনও দেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের সরকারের পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার খাত ছিল কৃষি। কৃষিকে আধুনিক করা এবং এ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যায়, দরিদ্র কৃষককে বাঁচানো যায়, সর্বোপরি কৃষিতে কীভাবে বহুমুখিতা আনা যায়। তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ। কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা হয়। ধান, পাট, তামাক, আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে কৃষিপণ্যের ন্যায়সংগত মূল্য কৃষক পান। দরিদ্র কৃষকদের বাঁচানোর স্বার্থে সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন সুবিধা তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসা হয়। স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহে রেশনব্যবস্থাকে বিস্তৃত করা হয়।

স্বল্পমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহে টিসিবির মাধ্যমে কসকর দোকান চালু করা হয়।

খাসজমি ও নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খায়-খালাসি আইন পাশ, বন্ধকি চুক্তি কবালা জমি সাত বছর ভোগ করা হলে তা মালিককে ফেরত প্রদান, যাতে জোতদারদের কাছ থেকে কৃষক জমি ফেরত পায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি পরিব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা ছিল কৃষি খাতের উন্নয়ন, কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তন। এ পরিকল্পনার যে ১২টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, এর দ্বিতীয়টি ছিল অর্থনীতির প্রধান খাতগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে কৃষি ও শিল্প খাতের। উল্লেখ্য, সেই সময়ে কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূলধারা, মোট দেশজ উৎপাদনের সিংহভাগই আসত কৃষি খাত থেকে। এ পরিকল্পনার চতুর্থ উদ্দেশ্য হিসাবে বিবৃত হয়েছে–'আবশ্যিক ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি', যা মূলত কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস। সময়ের বাস্তবতা বিবেচনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ছিল অর্থনীতির সেই খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যে খাত অধিকসংখ্যক মানুষের শ্রমে নিয়োজিত থাকার নিশ্চয়তা দেয় এবং ব্যবহার করে শ্রমঘন উৎপাদন পদ্ধতি। ১৯৭২-৭৩ সালে জিডিপির ৫৬.১ শতাংশ আসত কৃষি খাত (শস্য, প্রাণিসম্পদ, বন ও মৎস্য) থেকে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানিনির্ভরতা কমানো। পরিকল্পনায় কৃষিমূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন ১২টি উন্নয়ন খাতের মধ্য সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পায় কৃষি ও পানিসম্পদ। পরিকল্পনা দলিলে কৃষি খাতের উদ্দেশ্য ও সার্বিক কৌশল বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়। বলা হয়, পরবর্তী দুই দশকের জন্য কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য হবে প্রথাগত ও আবহাওয়ানির্ভর অনিশ্চিত কৃষির স্থলে ক্রমান্বয়ে টেকসই আধুনিক কৃষিব্যবস্থার প্রচলন। পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল দুটি: খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং গ্রামীণ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সর্বনিম্ন খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আয় নিশ্চয়তা প্রদান। এ খাতের অন্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল: কৃষি আয়বৃদ্ধি; গ্রামীণ শ্রমশক্তির জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান; ক্ষুদ্র খামারি ও ভূমিহীনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসহ গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস এবং আয় বণ্টনে অসমতা দূরীকরণ।

১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেল উত্তোলন ও সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে হুহু করে দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠলে বিশ্বে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। মুদ্রাস্ফীতি সব দেশকে গ্রাস করে। বাংলাদেশের বহু সমস্যাসংকুল স্বাধীনতা অর্জনের দ্বিতীয় বর্ষের এই আকস্মিক আঘাত অর্থনীতিকে বড়ো রকমের ঝাঁকুনি দেয় এবং আমাদের দেশেও মুদ্রাস্ফীতি প্রায় অসহনীয় অবস্থায় চলে যায় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৩-৭৪ সালেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়। এত সমস্যা সামাল দিয়েও ১৯৭৪ সাল থেকে পরিকল্পিত অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয় ৯ শতাংশ। বঙ্গবন্ধুর জাদুকরী নেতৃত্বের প্রভাবে সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। পঁচাত্তরের চরম বিয়োগান্ত বেদনাবিধুর ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির শুরু হওয়া উল্লম্ফনের ধারা আবার বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। পরবর্তী দুই দশকের জন্য দেশ নিপতিত হয় রাজনীতি-অর্থনীতিতে মূলত পাকিস্তানি মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক বিপরীত অনিশ্চিত যাত্রাপথে।

লেখক: সামষ্টিক পরিকল্পনাবিদ, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

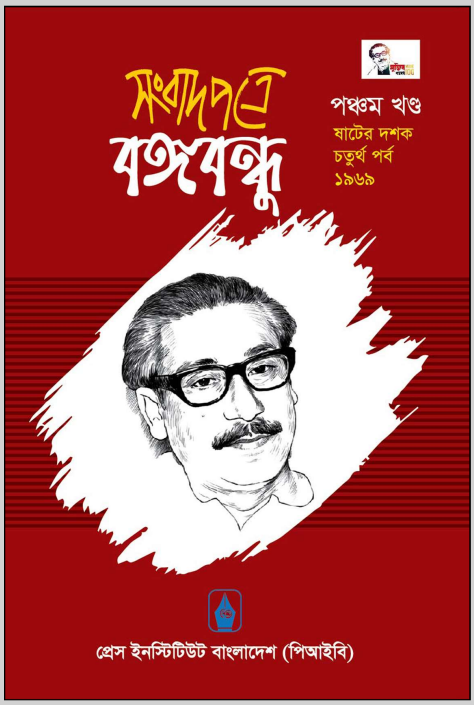

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্মার্ট বাংলাদেশের বীজ বঙ্গবন্ধু বপন করেছেন

মোস্তাফা জব্বার

কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষই জানে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দলের নির্বাচনি ইশতাহার ঘোষণাকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন। সেই ইশতাহারের নামই ছিল 'দিনবদলের সনদ'। তাতে ২০২১ সালে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই, এর একুশ দফার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা 'দিনবদলের সনদ' নামেই উল্লেখ ছিল। ইশতাহারটির রচনা মূলত ২০০১ সাল থেকে শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের প্রস্তাবিত নির্বাচনের জন্য। কিন্তু সেই নির্বাচন ২০০৮ সালে পিছিয়ে যাওয়ায় ইশতাহারটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সর্বশেষ আপডেট করে প্রস্তুত ও ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ খসড়া তৈরি করা হয় ২০০৮ সালের ৬ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ধানমন্ডির অফিসে তৎকালীন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নূহ-উল-আলম লেনিনের কক্ষে বসে। ১১ ডিসেম্বর সেটি আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন করে এবং ১২ ডিসেম্বর দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা সেটি জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। সেই ইশতাহারে দিনবদলের সনদ অনুচ্ছেদের ১৪নং কলামে লেখা ছিল "২০২১ সালে তথ্যপ্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসাবে বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করবে।" আমরা সবাই জানি, সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনা শুরু করেন এবং এখনো লাগাতার দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করছেন। শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ সালে কতটা দৃশ্যমান হয়েছে, সেটি নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি বুঝি, এদেশের ছোট্ট শিশুটিও এখন বোঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, কেন এবং তার জীবনেও ডিজিটাল বাংলাদেশ কত প্রয়োজনীয়। এরই মধ্যে ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ ঘোষণাটিও এখন মানুষের মুখে মুখে। ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে স্মার্ট

বাংলাদেশ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। কেউ কেউ মনে করতে পারেন ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ দুটি ভিন্ন বিষয়। বিষয়টি আসলে তেমন নয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির ওপরেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা তিনি পুত্র ও তাঁর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকে পেয়েছেন। যাঁরা জানেন না তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, তিনি ১৯৯১ সালে কম্পিউটার চালনা শিখে সেটি নিজে সবার আগে অনুশীলন করেন। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম রাজনীতিক, যিনি কম্পিউটার চর্চার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অনেকে এটাও হয়তো জানেন না, তিনিই প্রথম দেশের কোনো রাজনৈতিক দলকে ডিজিটাইজ করেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। ১৯৯১ হোক আর ১৯৯৬–বাংলাদেশের রাজনীতি বা সরকারে শেখ হাসিনার হাত ধরে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে তথ্যপ্রযুক্তির সপক্ষে গ্রহণ করা যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলো একটি কৃষিপ্রধান শিল্পবিপ্লব মিস করা দেশকে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব বা তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করায়। সেই দেশটিই ২০০৯ সালে চতুর্থ/পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের যুগে পা রাখে। এ কথাটি বলার প্রয়োজন নেই যে, স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণাটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

ওপরের যে তথ্যগুলো আমরা তুলে ধরেছি তাতে বাংলাদশের ডিজিটাল যুগে যাত্রার ন্যূনতম খতিয়ান বর্ণিত হয়েছে। আমাদের জানার বিষয় হতে পারে–বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর কি তখন থেকেই শুরু। দুনিয়াতে কেউ যখন ডিজিটাল যুগের কথা ভাবেননি, তখন শেখ হাসিনা ডিজিটাল যুগের নির্মাণকাজও শুরু করে দেন, যা কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের জন্য ছিল অকল্পনীয়। তিনি কিন্তু সেই কাজটিই শুরু করেন এবং এজন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লব/পঞ্চম শিল্পবিপ্লব বা সোসাইটি ৫.০-এর যুগে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে।

আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করেই আলোচনাটি এভাবে করতে চাই–ডিজিটাল বাংলাদেশের বা স্মার্ট বাংলাদেশের সূচনা কি ২০০৮ সালে নাকি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করেই দেশটিকে ডিজিটাল/স্মার্ট যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। অনেকের কাছেই আমার এই মন্তব্য বিস্ময়কর মনে হবে। কিন্তু আমি নিজে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, ডিজিটাল বাংলাদেশ/স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে কাজগুলো আমরা পরে করেছি, এর অনেকটাই তিনি শুরু করে দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু আক্ষরিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেননি; কিন্তু বাংলাদেশের আজকের ডিজিটাল/স্মার্ট রূপান্তরের বীজ তিনি আপন হস্তে বপন করেন।

যদি ঘোষণার কথা বলি তবে সেটি হলো, তিনি সোনার বাংলা গড়ার কথা বলেছিলেন। আমি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে তাঁর ডিজিটাল/স্মার্ট সাম্যসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন বলে চিহ্নিত করি। এর মানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, শোষণ ও বৈষম্যহীন প্রযুক্তিনির্ভর সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ঘোষণা এখনো বহমান একটি স্বপ্ন। আমরা কেবল ডিজিটাল বাংলাদেশ নয়, ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজই করছি। যে কেউ অনুধাবন করবেন স্বাধীনতার সেই সূচনালগ্নে কী পরম দূরদর্শিতার বলে বঙ্গবন্ধু এমন একটি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন।

১৯৭২-৭৫ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু যেসব কাজ করে গেছেন, এর কয়েকটার অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করছি।

১. মানবসম্পদ

সবাই জানেন, ডিজিটাল যুগ মানে মেধাসম্পন্ন সৃজনশীল মানবসম্পদ। কায়িক শ্রমের দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মেধাসম্পদের যুগের সূচনা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন, এর চারটি পিলারের একটি মানবসম্পদ। তিনি যখনই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেন, তখনই স্মার্ট বা দক্ষ মানবসম্পদের কথা

বলেন। ভাবুন তো এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের জনপদে সবার আগে যিনি ভাবেন, তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে এই মানবসম্পদ গড়ে তোলাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। তিনি ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাকে ছুড়ে ফেলে দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের পদক্ষেপ নেন। শাসনভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদাকে সভাপতি করে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগটিই বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন। বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, আইন, ললিতকলা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করে এ কমিশন। যাতে বাঙালি জাতি শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রসর হতে পারে।

তিনি একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর সময়কালের ছাত্রদের সব বকেয়া টিউশন ফি মওকুফ করেন, শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন; আর্থিক সংকটে থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করেন এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে তিনি দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করেন। এর ফলে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন। জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশের মাধ্যমে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু। এটি বস্তুত আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালে বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করা।

শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল বঙ্গবন্ধুর। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনের সময়েও তিনি কার্যকরী সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে জনমুখী ও সম্প্রসারণ করতে কোনো কৃপণতা করেননি।

শিক্ষকদের উদ্দেশে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করছে। শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।'

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় সত্তরের নির্বাচনের সময় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন। যথা: প্রথমত, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।' দ্বিতীয়ত, 'নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে।' তৃতীয়ত, 'দারিদ্র্য যেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবীদের জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।'

॥ দুই ॥

মানবসম্পদ যে স্মার্ট বাংলাদেশের প্রধান ভিত্তি, এর উল্লেখ আছে আরও একটি বিষয়ে। সেটি হচ্ছে স্মার্ট নাগরিক। বস্তুত এর মানেও দক্ষ মানবসম্পদ। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ দক্ষতা ডিজিটাল দক্ষতা। প্রযুক্তি হচ্ছে এ দক্ষতা অর্জনের ভিত্তি। একইভাবে মনে করা দরকার, স্মার্ট সমাজ বা স্মার্ট সরকারও একই রকমভাবে প্রযুক্তিনির্ভর ও গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন বহু আগেই। ১৯৭১ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন বিশ্বে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব চলছিল। দেশের মানুষ যাতে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আইটিইউ (International Telecommunication Union)-এর সদস্যপদ লাভ করে। সে বছরই বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন তিনি বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগব্যবস্থাকেও তিনি সক্রিয় করে তোলেন। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই ৫৫ হাজার টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করেন। ফলে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহজেই সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে স্থগিত হয়ে যাওয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ২০২৫ সাল নাগাদ ২৭টি দেশে ১৭৩টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এগুলোর মধ্যে ৩০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই নির্মাণ করা হবে পরমণু বিশ্বে নবাগত দেশগুলোয়, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করেন। প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালের ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব সপ্তাহের উদ্‌বোধনকালে বলেন, 'বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।' এ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়, দেশগড়ায় বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ রসায়ন সমিতির সম্মেলন উপলক্ষ্যে এক বাণীতে তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবেন।' প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের কাছে বঙ্গবন্ধুর অনেক প্রত্যাশা ছিল। ১৯৭৫ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের এক যৌথ সম্মেলনের উদ্‌বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যে কোনো দেশের শতকরা ৮০ ভাগ উন্নতি নির্ভর করে সে দেশের প্রকৌশলী ও কারিকরদের ওপর।' স্থানীয় অবস্থার পটভূমিকায় সমস্যার সমাধান খোঁজার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের তিনি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ, পরিবেশ, দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র উৎক্ষেপিত আর্থ রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইটের (ইআরটিএস) প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ

> বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে এই মানবসম্পদ গড়ে তোলাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। তিনি ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাকে ছুড়ে ফেলে দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের পদক্ষেপ নেন। শাসনভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন

ইআরটিএস নামের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)' তৈরি হয়। এছাড়া বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধুর সময়ে বেশকিছু অর্ডার, অধ্যাদেশ ও আইন তৈরি করা হয়। যেমন: ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন অর্ডার, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন প্রভৃতি। এগুলো তৈরির মাধ্যমে দেশে নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরিসহ বিজ্ঞান গবেষণার পথ প্রসারিত হয়। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১৫০০ কিমি. বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন এবং দেশব্যাপী পল্লি বিদ্যুৎ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লি বিদ্যুদায়নের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশন করা হয়। তাঁর কাজের মঙ্গে ছিল ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্‌বোধন। সস্তায় রেডিয়ো-টিভি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মিগ বিমান হেলিকপ্টার ও পরিবহণ বিমান সংগ্রহ করা হয়। যুগোস্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। ৪০০ ধ্বংসপ্রাপ্ত সাবস্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হয়। খুলনা, রাজশাহী ও সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশন পুনঃসংস্কার, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন, জাতিসংঘের সহায়তায় ৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকার পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের পদক্ষেপ, নতুন শিক্ষা বোর্ড গঠনসহ তিনি অসংখ্য যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডের আরও কিছু তথ্য দেওয়া যেতে পারে–১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার অ্যাগ্রিকালচার গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি আধুনিকায়নে পানি ও যন্ত্র সরবরাহের ফলে ১৯৭১-৭২ সালের ২৫, ৮৭ ও ৩০০ একর আবাদি জমি ১৯৭৪-৭৫-এ যথাক্রমে ৩৫, ৬১ ও ৪৭২ একরে উন্নীত করেন অর্থাৎ, কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কৃষি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরকে তিনি পরিপূরক খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি মিলকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের সম্প্রসারণ শুরু করেন। এর ফলে স্বাধীনতার প্রথম বছরে পাট, বস্ত্র, কাগজ এবং সার কারখানা যথাক্রমে ৫৬, ৬০, ৬৯ ও ৬২ শতাংশ উৎপাদনক্ষমতা ধারণ করে, যা স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৪-৭৫ বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করেন, যেখানে নতুন শিল্প স্থাপনের বিধান রাখা হয়।

৩. বাংলা ভাষা প্রচলন

আজীবন বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করা মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে যেমন চীনের আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে বাংলায় ভাষণ দেন, তেমনই ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘেও বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রচলনের জন্য দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেন। বঙ্গবন্ধুর একটি অমর কীর্তি হচ্ছে বাংলা টাইপরাইটার প্রবর্তন করা। তিনি ১৯৭২ সালে শহিদ মুনীর চৌধুরী আবিষ্কৃত মুনীর কীবোর্ডের ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব জার্মানি বা গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের অপটিমা কোম্পানির সঙ্গে মিলে অপটিমা মুনীর বাংলা টাইপরাইটার প্রবর্তন করেন, যা বাংলা একাডেমি বাজারজাত করে। এর আগে পঞ্চানন কর্মকার ১৭৭৮ সালে ছেনিকাটা সিসার বাংলা হরফ তৈরি করেন। পশ্চাৎপদ বাংলা ভাষাকে যন্ত্রে ব্যবহার করার এই সক্ষমতা অর্জনকে প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রয়োগের একটি বড়ো মাইলফলক হিসাবে দেখতে হবে। এই টাইপরাইটারের ভিত্তিতেই ১৯৮৭ সালের ১৬ মে প্রথম বাংলা কীবোর্ড জব্বার তৈরি হয় এবং কম্পিউটারে কম্পোজ করা প্রথম বাংলা পত্রিকা আনন্দপত্র প্রকাশিত হয়। পরে বিজয় কীবোর্ড ও অন্যান্য কীবোর্ড এসে এর জায়গা দখল করতে থাকে।

৪. স্মার্ট সরকার

বঙ্গবন্ধু একটি দক্ষ জনগণের সরকার গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি ডিজিটাল সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

খুব সংগতকারণেই বঙ্গবন্ধুর আরও যেসব কাজ আছে সেগুলো এখানে তুলে ধরিনি। তবে আমি মনে করি, অতিসংক্ষেপে যে কয়টি কাজের কথা আমি এখানে উল্লেখ করেছি তাতেই এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নটাই কেবল তিনি দেখেননি, তিনি কেবল সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নটাও দেখেননি, প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় আমরা আজ যে মানবিক স্মার্ট/ডিজিটাল যুগের কথা বলছি, এর চারা বঙ্গবন্ধুর রোপণ করা বীজ থেকেই অঙ্কুরিত। আমরা আজকাল ডিজিটাল/স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে একটি ডিজিটাল সাম্যসমাজ গড়ার কথা বলি। এই সাম্যসমাজটির কথা ভাবতেও বঙ্গবন্ধুর কৃষি সংস্কার এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা ভাবতে হবে। তিনিই সমাজটাকে কেবল ডিজিটাল নয়, সাম্যসমাজ হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। আমরা গর্বিত–জাতির পিতার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর সোনার বাংলা গড়ছি এবং তাঁর রোপিত ডিজিটাল বাংলাদেশ সেই সোনার বাংলা বা ডিজিটাল সাম্যসমাজ গড়ার হাতিয়ার।

লেখক: মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়,
তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর
চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার প্রণেতা

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা

ড. আরএম দেবনাথ

আগস্ট শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের এ মাসের ১৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘাতকদের গুলিতে সপরিবারে শহিদ হন। এরপর কেটে গেছে অনেক বছর। প্রতিবছরই ফিরে আসে এই শোকাবহ দিন–১৫ আগস্ট। এবারও এসেছে। জাতীয়ভাবে শোক পালিত হচ্ছে সারা দেশে। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর নানা আলোচনা, সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়–কেমন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। কেন, কারা, কী প্রেক্ষাপটে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর জীবনের, আদর্শের সব দিক এখন আলোচনা, গবেষণার বিষয়বস্তু। যেসব বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে, এর মধ্যে অর্থনীতি অন্যতম। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন। কী ধরনের অর্থনীতি দেশের জন্য চেয়েছিলেন। ব্যাবসাবাণিজ্য কীভাবে চলবে, অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের স্থান কোথায় থাকবে, সম্পদের মালিকানা কেমন হবে–এসব বিষয় মানুষ এখন জানতে চায়। এসব থেকে শিক্ষা নিতে চায়।

আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে ১৯৭২ সাল থেকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়–আমরা হই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন। চারদিকে তখন ধ্বংসস্তূপ।

দেওয়ালে দেওয়ালে শহিদদের রক্ত। বিতাড়িত এক কোটি শরণার্থী ভারত থেকে দেশে ফিরতে শুরু করে। তাদের ঘরবাড়ি নেই। নয় মাস কৃষিকাজ ছিল বন্ধ-বিঘ্নিত। আমদানি-রপ্তানি বিঘ্নিত। দেশের রাস্তাঘাট সব ভাঙাচোরা। ব্রিজ-পুল বিধ্বস্ত। বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর বিনষ্ট। মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন নয়। ৩০ লাখ শহিদের স্বজনদের কান্না চারদিকে। শিল্পকারখানা সব বন্ধ। কাঁচামাল নেই। বহু শ্রমিক-কর্মচারী নিহত। অফিসকর্মী, ব্যাংককর্মী নিহত। অনুপস্থিত। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূন্য। ব্যাংকে কোনো 'ক্যাশ' নেই। সব টাকা 'পাকিস্তানিরা' তুলে নিয়ে যায়। এককথায়–এক বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। জাতীয়, ব্যাবসায়িক, অর্থনৈতিক সংকটে দেশ। কারখানা চালু করতে হবে, কৃষি উৎপাদন চালু করতে হবে। ব্যাংক-বিমা-অফিস-আদালত চালু করতে হবে। দরকার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। সেই নেতৃত্বে এলেন বঙ্গবন্ধু–পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে।

বঙ্গবন্ধু প্রথমেই ব্যাংক-বিমা পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন–সব হলো রাষ্ট্রায়ত্ত। শিল্পকারখানা চালুর ব্যবস্থা করলেন। সেজন্য দরকার ছিল 'ক্যাশের'। এর ব্যবস্থা করলেন। তিনি পাকিস্তানি আমলের (১৯৪৭-৭১) ব্যাংকগুলো পুনর্গঠন করে ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেন। কৃষির জন্য, শিল্পের জন্য আলাদা ব্যাংক-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। বিমা খাতকেও তিনি পুনর্গঠন করলেন। ডজন-ডজন বিমা কোম্পানি এক করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন দুটি বিমা কোম্পানি–একটি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, আরেকটি জীবন বীমা কর্পোরেশন। এই খাতে বিশেষজ্ঞদের জায়গা করে দিলেন। ব্যাংকেও তাই। বাঙালি বড়ো বড়ো কর্মকর্তাকে পদস্থ করলেন। 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (এসবিপি)'-এর পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রাদেশিক কার্যালয়কে বানালেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সহজ-সোজা নামকরণ। কেনো জটিলতা নেই। পণ্ডিতরা কত নামের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রদত্ত নাম: 'বাংলাদেশ ব্যাংক'–আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নামকরণেও তিনি আপাদমস্তক বাঙালি: সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, উত্তরা, পূবালী ব্যাংক। নামকরণে কোনো জটিলতা নেই। কৃষির জন্য ব্যাংকটির নাম দিলেন: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। তিনি প্রথমেই কলকারখানার জন্য 'ক্যাশের' ব্যবস্থা করলেন। লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত/শরণার্থীর জন্য পুনর্বাসন ঋণের ব্যবস্থা করলেন। ছোটো ছোটো শিল্প-ব্যাবসার জন্য ছোটো ছোটো ঋণের ব্যবস্থা করলেন। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন কৃষি ও গ্রামের ক্ষেত্রে। প্রথম দফাতেই নির্দেশ–ব্যাংক, তোমরা গ্রামে যাও, সেখানে শাখা খোল। কৃষকদের ঋণ দাও। যেই কথা সেই কাজ। অচিরেই সারা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শত শত ব্যাংক-শাখা। সেখান থেকে শুরু হয় গ্রামীণ উন্নয়নে 'ফিন্যান্সের' কাজ। বাঙালি যাতে আমদানি-রপ্তানি ব্যাবসা শিখতে পারে, এজন্য তিনি ইউনিয়নে-ইউনিয়নে 'আমদানি লাইসেন্স' দিয়েছিলেন উদ্যোক্তাদের। অর্থনীতি পুনর্গঠনে ব্যাংক ছিল মূল বিষয়। তিনি যথার্থভাবেই ওইদিকে নজর দেন। অর্থনীতি পুনর্গঠনে, সংস্কারে, পুনর্বাসনে তিনি সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করলেন দ্বিধাহীনভাবে। এদিকে শিল্পের কী হবে?

পাট, বস্ত্র, ইস্পাত, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি ব্যাবসা থেকে শুরু করে সব বড়ো শিল্পকারখানার মালিক ছিল 'পাকিস্তানিরা'। বাঙালির মালিকানায় ছিল খুবই কম–বরং বিরল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর 'পাকিস্তানি মালিকরা' অনুপস্থিত। সব বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন শুরু হয় দ্বিমুখী দাবি। নব্য ধনীরা চায় শিল্পকারখানা-ব্যাংক-বিমা সব তাদের হাতে দেওয়া হোক। সব থাকবে বেসরকারি খাতে। আর জনতার দাবি, ১১ দফা এবং ছয় দফার দাবি ছিল সব হবে রাষ্ট্রায়ত্ত। বিপুল চাপ সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। বড়ো বড়ো ব্যাংক-বিমা, কারখানা–সব রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন। বাঙালি মালিকানাধীন দুটো ব্যাংক ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানে'। তিনি এ দুটিকে আলাদা করলেন, যা আজকের উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক। একেকটি শিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো একেকটি শিল্প সংস্থা-সেক্টর করপোরেশন। যেমন: 'পাটকল সংস্থা', 'চিনিকল সংস্থা', পাট রপ্তানি সংস্থা, ইস্পাত কারখানা সংস্থা, বস্ত্র কারখানা সংস্থা, রাসায়নিক শিল্প সংস্থা প্রভৃতি। যতটুকু মনে পড়ে, তৈরি হয় মোট ১০টি শিল্প সংস্থা। শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা। বিভিন্ন জায়গা থেকে দক্ষ লোকদের জোগাড় করে এসবের নেতৃত্বে বসান তিনি। শুধু শিল্পের জন্যই নয়, ছোটো-মাঝারি ব্যাবসা, কারখানার প্রতিও তাঁর নজর ছিল। সেসব যাতে সঠিকভাবে চলে এর জন্য প্রতিটিতে বসানো হয় 'প্রশাসক' (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)। এদিকে আমদানি ব্যাবসাকে সহজ ও বাধাবিঘ্নহীন করার জন্য তৈরি হয় 'ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)'। আমদানিকৃত পণ্য বণ্টনের জন্য তৈরি করা হয় আরেকটি প্রতিষ্ঠান। এর নাম 'কনজিউমার সাপ্লাইজ করপোরেশন (কসকর)। এটি অবশ্য এখন উঠে গেছে।

এককথায় স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ব্যাংক-বিমা জাতীয়করণ করা, শিল্প জাতীয়করণ করা, বড়ো রপ্তানি-আমদানি ব্যাবসা জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে দরকার ছিল দূরদর্শী নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু সেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রবল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও। ব্যবসায়ীদের বাধা ছিল, রাজনৈতিক বাধা ছিল। বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রবল চাপ ছিল। এসবের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ থেকে একচুলও নড়েননি। তিনি যে আদর্শের জন্য লড়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই একই আদর্শের পথ ধরে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির সূচনা করেন। লক্ষ্য–বৈষম্যহীন, শোষণহীন সোনার বাংলা গঠন।

শীঘ্রই রচিত হয় আমাদের সংবিধান। খুব স্বল্পসময়ের মধ্যে তৈরি হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান, যার ছিল চার মূলনীতি: জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। শ্রেষ্ঠ সব ধারা ওই সংবিধানে সংযোজিত হয়। খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবিধানে দেশের সম্পদের মালিকানাকে তিনভাগে ভাগ করেন–সরকারি, সমবায় ও বেসরকারি। অবশ্যই সেই ব্যবস্থায় সরকারি মালিকানার ছিল প্রাধান্য। এর পরেই ছিল সমবায়ী মালিকানা। বেসরকারি মালিকানার বিষয়টি ছিল তিন নম্বরে। এ কথাটি আমরা আজ প্রায় ভুলেই গেছি। তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেই শেষ করেননি, সাধারণ মানুষের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত সমবায় ছিল তাঁর চিন্তায়, যার প্রতিফলন ঘটে পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)' গঠনে। কৃষি ক্ষেত্রে তিনি বড়ো জোতদারদের প্রাধান্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা করে দিয়েছিলেন।

সর্বোচ্চ সীমা রাখা হয় ১০০ বিঘা। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। একই সময়ে আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির সময়ে। এই পরিকল্পনাটি ছিল ১৯৭৩-৭৮ সালের জন্য। সমবায়, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে হাতিয়ার হিসাবে নেন। আমরা জানি, সেই সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের কোনো কোনো সদস্য পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে একমত ছিলেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পিছপা হননি। তাঁর সব চিন্তায় ধারণায় সাধারণ মানুষের স্বার্থ ছিল এক নম্বরে। নব্যধনী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, সাবেক 'পাকিস্তানি' চিন্তার লোকজন, সাম্প্রদায়িক শক্তির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি একের পর এক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেন মানুষের কল্যাণে। তিনি 'বিনিময় বাণিজ্য' (বার্টার ট্রেড) পছন্দ করতেন। তৎকালীন 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' (বর্তমান রাশিয়া)-এর সঙ্গে আমাদের বিনিময় বাণিজ্য চালু হয়েছিল। অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য। দেখা যাচ্ছে, বর্তমান ডলার সংকটের মধ্যে ডলারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়াই এখন বিনিময় বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকছে। ডলারকে পরিহার করে নিজেদের মুদ্রায় আমদানি-রপ্তানিব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু বেসামরিক খাতের বিরুদ্ধে ছিলেন না। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সরকারি খাতের প্রাধান্য ঠিক রেখে। বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতির কল্যাণে বেসরকারি খাত যে উগ্র মূর্তি ধারণ করেছে, এর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বেই এখন জনমত বেড়ে উঠছে। এর থেকে প্রমাণ হয় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার। তিনি চেয়েছিলেন উন্নত আলোকিত 'অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ'।

বঙ্গবন্ধুর একটি বড়ো সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)' গঠন। সংবিধান এবং সেই অনুসারে রচিত

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল সমতার আদর্শ, শোষণহীন সমাজ ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সেখানে থাকবে না কোনো বৈষম্য, যার বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। তৈরি করেছিলেন ছয় দফা, পরে সমর্থন করেছিলেন ১১ দফার দাবিগুলো। শোষণহীন, বৈষম্যহীন আলোকিত বাংলাদেশ গঠনে তাঁর সর্বশেষ যুগান্তকারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল 'বাকশাল' গঠন। 'বাকশাল' মানে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। এর মানে কী? 'আওয়ামী লীগ', কিন্তু এই আওয়ামী লীগ হবে কৃষক-শ্রমিকের সুনির্দিষ্টভাবে। এতে কী ছিল? তখনকার প্রভাবশালী মিডিয়ার একটা অংশ থেকে বারবার বলা হলো এটি 'একদলীয় শাসন'। হ্যাঁ, দৃশ্যত তাই। দল একটি। কিন্তু সেখানে সবারই স্থান। রাজনৈতিক কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, বাহিনীর সদস্য, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী–সবাই শামিল হবে এতে। কেন? দেশ শাসন করতে? কিন্তু বড়ো কথা কেমন দেশ, কেমন তার অর্থনীতি? এখানেই ছিল মূলকথা, মূল আদর্শ। তিনি শোষণহীন সমাজ, বৈষম্যহীন উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এর মূলে ছিল 'কম্পলসারি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি'–বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় সমিতি। আদর্শ হিসাবে এতে কী ছিল? রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানা হবে সমবায়ের ভিত্তিতে। মালিকানা, উৎপাদনব্যবস্থা এবং বণ্টনকাজে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। ভিত্তি 'সমবায়'। এতে শোষণের কোনো বালাই থাকবে না। সম্পদ কুক্ষিগত হবে না, বৈষম্য তৈরি হবে না। ভাগাভাগি করে খাওয়া-ওঠা-বসা প্রভৃতি। এখানেই ছিল নব্যধনী, কুচক্রী সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং পুঁজিবাদী কয়েকটি দেশের আপত্তি। নেপথ্যে কাজ করছিল 'পাকিস্তানি ভূতেরা', যারা ২৪ বছর 'পাকিস্তান' আমলে এদেশে আমাদেরকে শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল ধর্মের নামে। ধর্মের নামে শোষণ। বঙ্গবন্ধু ভাষার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সাম্যের একটি দেশ, যা হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। তিনি এ কথা প্রকাশ্যে বলতেন। বৈষম্যের অনুসারী, ধর্মান্ধ গোষ্ঠী, পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা 'বাকশালকে' প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে জাতির মূলে আঘাত করে ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধু নিহত হন ওই রাতে। সঙ্গে নিহত হন সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন সন্তান, দুই পুত্রবধূ–তাঁরা। এরপর নতুন ইতিহাস। ২৪ বছর চলে (১৯৭৫-১৯৯০) স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে পেছনে ঠেলে একটা পশ্চাৎপদ সমাজের দিকে পা বাড়ায় বাংলাদেশের কুচক্রীরা। অবশ্য বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে উন্নত, আলোকিত বাংলাদেশের।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

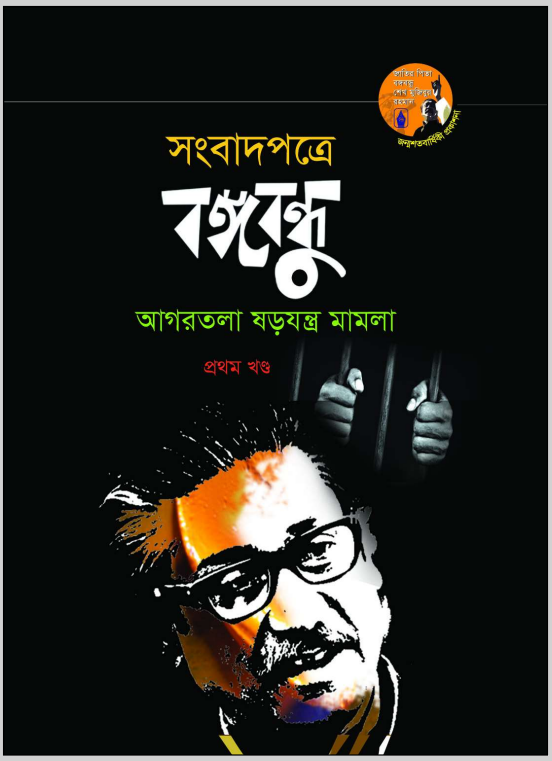

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা

মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আলী শিকদার

এক অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে, মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে, নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত দুঃখী মানুষের জন্য যে পথ দেখিয়ে গেছেন এবং নিজের জীবন ও কর্মের ভেতর দিয়ে যে বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির পিতা। একজন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কর্মী থেকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ সোপান। কিন্তু চরিতকাল স্বল্প। এই স্বল্প সময়ে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলি এবং তার সব বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে। অকুতোভয় সাহস, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি, সীমাহীন ত্যাগ, সব বস্তুগত প্রলোভনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান, মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, মানবতার প্রতীক ক্ষমা করার উদারতা, প্রতিহিংসামুক্ত মন–সবকিছুই তিনি আত্মস্থ করেছেন এই স্বল্প জীবনের পরিসরে। এজন্যই ইংরেজি সেই বাক্যটি 'লার্জার দ্যান লাইফ' বলতে যা বোঝায়, এর সবকিছু বঙ্গবন্ধুর জন্য শতভাগ প্রযোজ্য ও খাঁটি। বঙ্গবন্ধুর সব কর্ম ও চিন্তার মূল উৎস ছিল বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ। তিনি ছাত্ররাজনীতি থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতা হিসাবে সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরেছেন খেয়ে-না-খেয়ে। এর মাধ্যমে গরিব-দুঃখী মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন তিনি নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছেন। একই সময়ে তাঁর স্পর্শে মাটির মানুষ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছে, প্রতিবাদী হয়েছে, বন্দুকের নলের সামনে বুক পেতে দিয়েছে এবং চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে ৩০ লাখ জীবন দিয়েছে। বাংলার মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি এবং উন্নত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে ফেরত আসেন। তখন সম্পূর্ণ দেশটি ছিল একটি ভয়ানক ধ্বংসস্তূপ। দেশে খাদ্য নেই, টাঁকশাল নেই, ব্যাংক নেই। রাস্তাঘাট, রেল, বিমানসহ সব ধরনের অবকাঠামো এবং অফিস-আদালত সবকিছুই ছিল ধ্বংস-

প্রাপ্ত ও অচল। সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর তখনও অসংগঠিত। কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা ও স্বজনহারা। এরকম একটি ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে যে সাহসী এবং চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্তটি নেন তা হলো, অতিসত্বর দেশ থেকে মিত্রবাহিনী অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তন। সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭২ সালের মার্চেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে যায়। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনী ফেরত যাওয়ার ফলে ধ্বংসস্তূপের উপরে দণ্ডায়মান রাষ্ট্রের সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা প্রায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। যুদ্ধের শেষ প্রান্তে পাকিস্তানের সাহায্যার্থে আগত মার্কিন সপ্তম নৌবহর তখনও বঙ্গোপসাগরে আছে। পার্শ্ববর্তী বড়ো শক্তি চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে বারবার ভেটো দিচ্ছে। লন্ডনে জামায়াত নেতা গোলাম আযমের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার আন্দোলন শুরু হয়েছে। পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা তখনও মেনে নেয়নি। সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। নুরুল আমিন, মাহমুদ আলীসহ পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া বাঙালি নেতারা যে কোনোভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণ অসংগঠিত। কোনো অবকাঠামো নেই। এরকম এক নাজুক পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছিল পরস্পরবিরোধী বিষয়। এরকম এক বহুমুখী সংকটের মুখে রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টির দ্বারা একটিমাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কজনিত রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ওই কঠিন সময়ে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হন। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় বসে সই করেন ২৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি। ওই চুক্তিতে মোট বারোটি অনুচ্ছেদ ছিল। এর মধ্যে নবম অনুচ্ছেদে ছিল–কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেকে এতদুল্লিখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোনো প্রকার সাহায্যদানে বিরত থাকবে। তাছাড়া যে কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই আশঙ্কাকে নিবারণ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে উভয় পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে উভয় দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। সেসময়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে শান্তিচুক্তির উল্লিখিত অনুচ্ছেদেই ওই দুর্বল মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে কাজ করেছে। তখন আমাদের নিরাপত্তা রক্ষায় চুক্তিটি ছিল শক্তিশালী এক নিবারণ (Deterence)।

১৯৭১ সালের আগস্টে প্রায় হুবহু একই রকম একটা চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সই হয়। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির উল্লিখিত অনুচ্ছেদের মতো একই রকম একটি অনুচ্ছেদ ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্তির ভেতর ছিল। যার কারণেই মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন-তিনবার জাতিসংঘে ভেটো দেয়। ফলে পাকিস্তানের পরিপূর্ণ পরাজয় নিশ্চিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি। ভারত-বাংলাদেশ ও সোভিয়েত-ভারত, দুই চুক্তির আন্তসম্পর্কের সূত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী নৌবহর প্রেরণ করে এবং চীনের উত্তর সীমান্তে বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি প্রদান করে। এভাবেই সদ্যস্বাধীন দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যার সবকিছুই ছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির ফসল। এরপর বঙ্গবন্ধু দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এর অংশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন। নতুন বাহিনীও গঠন করেন, নাম দেন জাতীয় রক্ষীবাহিনী, যার শতভাগ সদস্য ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। সশস্ত্রবাহিনীকে একটা স্বাধীন দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী গঠন করে। সেনাবাহিনীর মর্যাদার প্রতীক বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি ১৯৭৪ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু উদ্‌বোধন করেন। একাডেমিতে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু নিজে উপস্থিত হয়ে সালাম গ্রহণ করেন। তিন বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাংক এবং বিমানবাহিনীর জন্য সেসময়ের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান মিগ-২১ ক্রয় করেন। নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ আনেন। রাষ্ট্রীয় প্রোটোকলে বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীকে সব বাহিনীর ঊর্ধ্বে স্থান দেন। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সব সেনা সদস্যকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সঙ্গে অঙ্গীভূত এবং স্বল্প সময়ে সমগ্র সেনাবাহিনীকে ব্রিগেড গ্রুপ ফোর্সে বিন্যাস করেন।

বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের কথা ভাবেননি। তিনি জানতেন আধুনিক যুগে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরে অশান্তি ও অস্থিরতা থাকলে এর বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশের ওপরও পড়বে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি বিশ্বাসযোগ্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শুধু নয়, পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন তৈরি করতে না পারে, তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই জনমানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হবে না। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শগত মিল থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধে তারা সর্বাত্মক সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছে। দুই দেশের রাষ্ট্রনীতিতে যতদিন অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল থাকবে, ততদিন দুই দেশের সম্পর্কে কখনো ফাটল ধরবে না–একথা বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী, দুজনেই জানতেন।

বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর দর্শন ছিল এক ও অভিন্ন। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকেও ভারত-বাংলাদেশের যৌথ দর্শনের বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। এ কারণেই অনেকের পরামর্শ উপেক্ষা করে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান যদি ন্যূনতম ১৯৫ জন বড়ো যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে, যৌথ পাকিস্তানের পুঞ্জীভূত সম্পদের ন্যায্য হিস্যা দিয়ে দেয় এবং বিগত দিনের সব হিংসাবিদ্বেষ ভুলে যায়; তাহলে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে ক্ষেত্র তৈরি হবে, এর সঙ্গে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভুটান অবশ্যই তখন তাতে যোগ দেবে, তখন এই অঞ্চল হয়ে উঠবে যৌথ সমৃদ্ধির এক অনন্য উদাহরণ। ইন্দিরা গান্ধীও যে একই রকম ধারণা পোষণ করতেন সেটির প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে তাঁর ভাষণের মধ্যে, যেখানে সব ফ্রন্টে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন তিনি। বলেন, 'We Should like to fashion our relations with the people of Pakistan on the basis of friendship and understanding. Let them live as masters in their own house and devote their energies to the removal of poverty and inequalities in their country.' It was in the same spirit that she entered into an agreement with the Pakistani Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto at Shimla in 1972.' (Ref. Shahana Dasgupta, Indira Gandhi; the story of a leader, Rupa Publications, 2004, P. 83)

ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত পাকিস্তানের ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাননি। এ কারণেই পশ্চিম ফ্রন্টের যুদ্ধে ভারতের বাহিনী কর্তৃক দখল করা প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল জায়গা ভারত ছেড়ে দেয়। বাংলাদেশ-

ভারতের যৌথ সিদ্ধান্তে ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরতে পাঠানো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর এত বড়ো উদারতা ও সদিচ্ছার কোনো মূল্য পাকিস্তান দেয়নি। বরং প্রতিহিংসায় জর্জরিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডে বড়ো ভূমিকা রাখে পাকিস্তান। পাকিস্তান সহযোগিতার পথে না এলে কী করবেন সে চিন্তাও বঙ্গবন্ধুর ছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধু নিহত না হলে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীও নিহত হতেন না, পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র সফল হতো না। বঙ্গবন্ধুর বিকল্প চিন্তা ছিল, পাকিস্তান না এলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে নিয়ে তৈরি করা হবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম। তাতে পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় পাকিস্তানও হয়তো একসময়ে সদিচ্ছায় সহযোগিতার পথে ফিরে আসতে বাধ্য হতো। আঞ্চলিক ফোরামে আসতে হলে প্রতিশোধের মনোভাব ও প্রতিহিংসা ত্যাগ করেই আসতে হতো পাকিস্তানকে। কিন্তু পঁচাত্তরের পর সবকিছু উলটে যায়। তাই বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ায় শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশে আবার একাত্তরে পরাজিত পাকিস্তানপন্থি রাজনীতির উত্থান ঘটে। দুই সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ পাকিস্তানি স্টাইলের ও পন্থার রাষ্ট্র তৈরির পথে হাঁটেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক পক্ষ এবং ভারতের বিরুদ্ধে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার কাজে বাংলাদেশের দুই সামরিক শাসককে সঙ্গী হিসাবে পায় পাকিস্তান। ফলে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যায়। কাশ্মীর ও পূর্ব পাঞ্জাবের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে সরাসরি সব রকম সমর্থন দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেয় পাকিস্তান। এদিকে জিয়া ও এরশাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে পাকিস্তান একই স্টাইলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলো সমর্থন দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু না থাকায় ইন্দিরা গান্ধী একা হয়ে যান। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নিজ বাসভবনে শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা গান্ধী। পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম সার্ক গঠিত হলেও কয়েক বছরের মাথায় পাকিস্তানের কারণেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে। সার্কের কোনো কার্যকারিতা এখন আর নেই। অথচ বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন এবং তাঁর ভূ-রাজনৈতিক চিন্তার বাস্তবায়ন হলে দক্ষিণ এশিয়ার চেহারা আজ ভিন্ন হতো। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ান থেকেও শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট হতো দক্ষিণ এশিয়ায়। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ত পুরো এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ভূ-রাজনৈতিক চিন্তার ব্যাপ্তি ছিল বিশাল বড়ো। সেটা হতে পারত বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার বড়ো এক অনুঘটক। ভারসাম্যমূলক বহুমুখী ভূ-রাজনীতির চিন্তায় ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু যেমন সহযোগিতা চুক্তি করেছেন, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সাহায্য চুক্তি করেছেন। আজকে পৃথিবীতে আমরা যে মাল্টিপোলার বিশ্বব্যবস্থার উত্থান দেখতে পাচ্ছি, তখনই এই পথে হাঁটতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে সংঘাত-সংঘর্ষ এড়িয়ে ভারসাম্যমূলক ভূ-রাজনীতির বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধুর নীতি অনুসরণ করছেন বলেই তাঁর মেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানের সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও সব শক্তি-পরাশক্তিকে একই সঙ্গে আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী করতে সক্ষম হয়েছেন।

লেখক: গবেষক, কলামিস্ট এবং রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

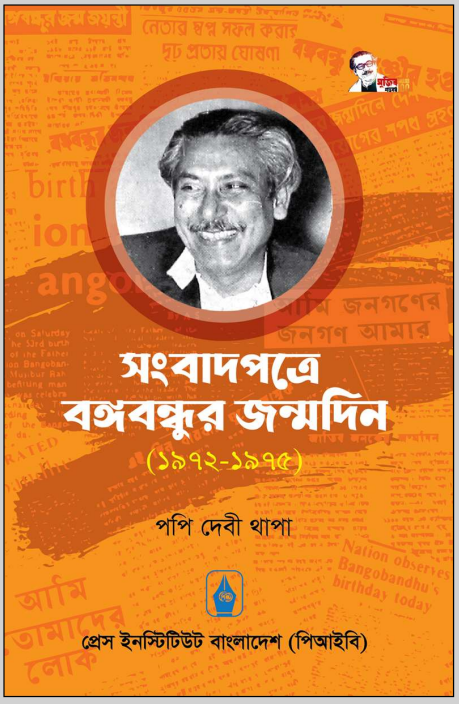

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর অবদানে কতটুকু এগিয়েছে আমাদের ওষুধশিল্প

অধ্যাপক আ ব ম ফারুক

অগ্রগতির পথে বাংলাদেশ দৃপ্তপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু আমাদের সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। শত ষড়যন্ত্র ও বাধা মোকাবিলা করে আজ তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি শর্তের সবই আমরা পূরণ করতে পেরেছি। ভিশন-২০২১-এর এটি একটি বিরাট অর্জন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানেই থেমে না থেকে আমাদের অগ্রযাত্রাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৩০ সালের পর ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে 'ভিশন-২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এজন্য দেশের সব নাগরিক, সব বিজ্ঞানী, সব পেশাজীবীকে অংশ নিতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ ও উন্নত রাষ্ট্রে পদার্পণের এই অভিযাত্রায় অন্য পেশাজীবীদের সঙ্গে আমরা ফার্মাসিস্টরাও অংশ নিয়েছি।

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন খাতের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, এর সঙ্গে ওষুধ খাতের অগ্রগতিও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ৫১ বছর আগে ১৯৭২ সালে আমরা উৎপাদন করতে পারতাম দেশের বার্ষিক চাহিদার মাত্র ১০-২০ শতাংশ ওষুধ। সেখানে আমরা আজ ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে আমাদের বার্ষিক ওষুধ চাহিদার ৯৮ শতাংশ নিজস্ব অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দিয়েই পূরণ করছি। পৃথিবীর আর কোনো দেশই তার চাহিদার ৯৮ শতাংশ ওষুধ নিজেদের কারখানা থেকে উৎপাদন করতে পারে না। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রও পারে না; পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো উন্নত দেশ, যার আয়তন আমাদের মেট্রোপলিস ঢাকার চেয়েও কম; কিন্তু ব্যাবসাবাণিজ্য-শিল্পায়নের কারণে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে, তারাও পারে না।

শুধু তাই নয়, আমরা আজ স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল, এমনকি সুইজারল্যান্ড ছাড়া বাকি সব উন্নত দেশেও ওষুধ রপ্তানি করছি। আমাদের ওষুধ রপ্তানির বাজার এখন পৃথিবীর ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৬৭টি দেশে।

আমাদের উৎপাদিত ও রপ্তানিকৃত ওষুধগুলোর মধ্যে উচ্চপ্রযুক্তির অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে ইনসুলিন, বিভিন্ন রকম টিকা, অ্যান্টিক্যানসার ড্রাগ, এইচআইভির ওষুধ, বার্ড ফ্লুর ওষুধ, এমনকি কোভিড-১৯-এর চিকিৎসার সর্বসাম্প্রতিকতম ওষুধও রয়েছে। এত বড়ো একটা করোনা মহামারি গেল। সারা বিশ্বে বড়ো বড়ো দেশ পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে। দেশের সব মানুষের জন্য টিকা পেতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুকৌশলী সিদ্ধান্তের ফলে সমস্যা হয়নি। এজন্য তাঁকে অভিনন্দন। করোনা চিকিৎসার ওষুধ কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত ছিল। করোনার যে ওষুধই উন্নত বিশ্বে আবিষ্কৃত হয়ে বাজারে এসেছে, আমাদের বড়ো ওষুধ শিল্প-কারখানাগুলো এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মরত বিপুলসংখ্যক ফার্মাসিস্ট এক সপ্তাহের মধ্যে তা 'জেনেরিক' নামে উৎপাদন করে বাজারে ছেড়েছে। আমাদের উৎপাদিত করোনার ওষুধ প্রচুর রপ্তানিও হয়েছে। আশা করছি, ভবিষ্যতে আমরা এদেশে সরকারি উদ্যোগে করোনাভাইরাসের টিকাও উৎপাদন করতে পারব। আজকের বাংলাদেশে ওষুধশিল্পের এই যে তাক লাগানো ও বলিষ্ঠ অবস্থান, এর পেছনে বঙ্গবন্ধুর যে অবদান ছিল, তা আমরা ওষুধবিজ্ঞানীরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই। কারণ, অন্যান্য সেক্টরের মতো ওষুধ সেক্টরেও বঙ্গবন্ধুর কিছু দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল, যা দেশের ওষুধশিল্পের ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

পঞ্চাশের দশকের আগে পূর্ববাংলায় কয়েকটি মাত্র স্থানীয় ওষুধ কোম্পানি ছিল। কিন্তু দেশীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ষাটের দশকে এখানে কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির আগমন ঘটে, সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি দেশি কোম্পানিও উৎপাদন শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার ওষুধের বাজারে আমদানিনির্ভরতা কমেনি। উপরন্তু দেশীয় উৎপাদন ও বিক্রয়ে বিদেশি কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য বজায় থাকে, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। স্বভাবতই ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো অনেক পিছিয়ে ছিল।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শক্ত হাতে বিভিন্ন সেক্টরে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তখন ওষুধ সেক্টরের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। দেশের চাহিদার ৮০ শতাংশেরও বেশি ওষুধ অত্যন্ত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানি করতে হতো। দেশে যে সামান্য উৎপাদন হতো, এরও সিংহভাগ ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত। ওষুধ সেক্টরে সরকারি নিয়ন্ত্রণও অত্যন্ত সীমিত ছিল। কারণ, এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কার্যকর সরকারি সংস্থা ছিল না। যা ছিল তা হলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বদলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি 'ড্রাগ কন্ট্রোলারের অফিস'। এর ফলে অনেক ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাজারে প্রচলিত ছিল। দেশের মানুষ যাতে প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় ওষুধটুকুই কেনে এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ করা যায়, সে লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত চিকিৎসককে নিয়ে ১৯৭৩ সালে একটি কমিটি গঠন করেন, যার প্রধান ছিলেন তখনকার বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম। কমিটিকে এ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ওষুধ বাছাই, মান যাচাই, পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। আমদানি নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে এজন্য গঠন করা হয় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) অধীনে একটি 'ড্রাগ সেল'। এর মাধ্যমে অনেক ওষুধের আমদানি নিষিদ্ধ এবং অনেকগুলোর আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাস্তব অর্থে, বাংলাদেশে এটিই ছিল প্রথম একটি 'ছায়া ওষুধনীতি', পূর্ণাঙ্গ না হলেও যা ছিল তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ওষুধ আমদানি খাতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ হয়, জনগণ অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পেছনে কষ্টার্জিত পয়সা খরচ না করে জীবনরক্ষাকারী ও অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের পেছনে তা খরচ করতে সক্ষম হয় এবং গরিব জনগণের জন্য সাশ্রয়ী খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান চালু করা সম্ভব হয়।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু ওষুধের আমদানি কমিয়ে দেশে মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন বাড়ানো এবং এ শিল্পকে সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর' গঠন করেন। তিনি দেশে নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য এরই মধ্যে যে 'বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক' ও 'বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা' গঠন করেছিলেন, তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওষুধ সেক্টরে নতুন শিল্পোদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে নির্দেশ দেন। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে নির্দেশ দেন নিবিড়ভাবে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিতে। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের প্রথম পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক হুমায়ুন কেএমএ হাই আন্তরিকভাবে এ নির্দেশ প্রতিপালন করতে থাকেন। ফলে অনেক নতুন দেশীয় ওষুধ শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। এর ফলে জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলোর দাম কমে আসার পাশাপাশি এগুলো সহজলভ্য হয়।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির পেটেন্টকৃত ওষুধও দেশীয় কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদনের জন্য গরিব দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে পেটেন্ট আইনের বাইরে রাখেন। আমলাতন্ত্র তখন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিল যে ওষুধের পেটেন্ট না মানলে পেটেন্টধারী বিদেশি কোম্পানিগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম ও অধ্যাপক হুমায়ুন কেএমএ হাই উভয়ের জবানিতেই শুনেছি, বঙ্গবন্ধু উত্তরে যা বলেছিলেন এর মর্মার্থ হলো, 'আমি সারা জীবন বাংলার মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সারা জীবন ঘর-সংসার ফেলে জেল খেটেছি। না হয় বাংলার মানুষের ওষুধের অধিকারের জন্য আরও কিছুদিন জেল খাটব। তারা মামলা করলে তো আমার বিরুদ্ধে করবে, তোমাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমাদের ভয় নেই। তোমাদেরকে যা বলেছি তা করো। ওসব পেটেন্টওয়ালা ওষুধ আমার দেশের কোম্পানিগুলোকে বানাতে দাও। আমার কাছে আগে আমার দেশের গরিব মানুষের জীবন। এত দাম দিয়ে তারা ওসব পেটেন্টওয়ালা ওষুধ খেতে পারবে না।'

ওষুধের পেটেন্ট না মানা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো এমন অকুতোভয় উচ্চারণ তখনকার তৃতীয় বিশ্বের আর কোনো রাষ্ট্রনায়ক করার সাহস পাননি। কয়েকটি বিদেশি ওষুধ কোম্পানি এজন্য মামলার প্রস্তুতিও নিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেশ-বিদেশে, বিশেষ করে গরিব দেশগুলোয় বাজার হারানোর ভয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করার মতো স্পর্ধা দেখায়নি।

বঙ্গবন্ধুর পেটেন্ট না মানার এই উদ্যোগের ফলে দেশীয় কোম্পানিগুলো বিপুল প্রণোদনা লাভ করে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কারণে জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলোর দাম কমে আসার পাশাপাশি এগুলো সহজলভ্য হয়। এভাবে দেশের জনগণ ও দেশীয়

ওষুধশিল্প উভয় পক্ষই উপকৃত হয়। দেশের অর্থনীতিতেও তা অবদান রাখতে শুরু করে।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় আসীন হওয়া সরকার বঙ্গবন্ধুর আমলের আমদানি-নিষিদ্ধ ওষুধগুলোর ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেয়। এর ফলে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধগুলো পুনরায় এদেশে আমদানি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদন শুরু হয়। ওষুধের বাজার পুনরায় প্রায় একচ্ছত্রভাবে বিদেশিদের হাতে চলে যায়। এ অবস্থা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এর অবসানে দেশের মানুষকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং দেশীয় ওষুধশিল্পকে পুনরায় প্রণোদনা দিতে ১৯৮২ সালে দেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ওষুধনীতি প্রণীত হয়। কিন্তু তাতেও বঙ্গবন্ধু সরকারের সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে যে ওষুধ আমদানি নীতিমালা বা 'ছায়া ওষুধনীতি' প্রণয়ন করা হয়েছিল, তাই ছিল মূলনীতি। আমরা সবাই জানি, ১৯৮২ সালের ওষুধনীতিটি ছিল রোগীবান্ধব ও শিল্পবান্ধব একটি অত্যন্ত সফল ওষুধনীতি।

আজ আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কম দামে জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলো তৈরি করতে পারছি এবং ওষুধের পেটেন্ট আমাদের দেশের ওপর ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে না, সেই সিদ্ধান্ত পেয়েছি। এ তৎপরতার জন্য আমরা বর্তমান সরকার এবং পথ দেখানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে ঋণী।

আমরা ফার্মাসিস্টরা আরও একটা কারণে বঙ্গবন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ। স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তানে ফার্মাসিস্টদের পেশাগত রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য কোনো 'ফার্মেসি কাউন্সিল' ছিল না। তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল, কিন্তু এখানে নয়। পাকিস্তানিরা যে আমাদের কতভাবে শোষণ করত, এটি তার আরেকটা উদাহরণ। যদিও ১৯৬৪ সালে এদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ফার্মেসি কাউন্সিল না থাকার কারণে এর গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টরা কোনো সরকারি স্বীকৃতি পেত না। তারা বিদেশে গিয়ে ফার্মাসিস্ট হিসাবে কাজ করতে সমস্যায় পড়ত। ফার্মেসি গ্র্যাজুয়েটস অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে সদস্যভুক্তির একটি সনদপত্র নিয়ে তাদেরকে বিদেশে পাড়ি জমাতে হতো। কিন্তু এটি ছিল কেবল একটি পেশাগত সংগঠনের স্বীকৃতি, কোনো সরকারি স্বীকৃতি নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার ফার্মাসিস্টদের এই পেশাগত রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বঙ্গবন্ধু তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মরহুম আবদুল মান্নান এমপিকে নির্দেশ দেন। তিনি ও অধ্যাপক হুমায়ুন কেএমএ হাই এ বিষয়ক আইনের খসড়া প্রণয়ন করে তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠান। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার কারণে সেটি বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হতে পারেনি। পুরো ১৯৭৫ সাল এই খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ে পড়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৬ সালে তা সামরিক সরকার কর্তৃক 'ফার্মেসি কাউন্সিল অ্যাক্ট'-এর পরিবর্তে 'ফার্মেসি কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স' আকারে ঘোষিত হয়। এ আইনটি প্রণয়নের তথা ফার্মাসিস্টদের সরকারি পেশাগত স্বীকৃতি প্রদানের নিয়ম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্যও আমরা ফার্মাসিস্টরা বঙ্গবন্ধুর কাছে ঋণী। এই রেজিস্ট্রেশনের কারণে এখন ফার্মাসিস্টরা বিদেশে প্রচুর সংখ্যায় চাকরি করতে পারছে এবং দেশেও ওষুধশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ওষুধ সেক্টরে বঙ্গবন্ধুর এসব অবদানের ফলে আজ আমরা ওষুধ উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর। একসময়কার চাহিদার ৮০ শতাংশের বেশি ওষুধ আমদানিকারক বাংলাদেশ আজ ৯৮ শতাংশ ওষুধ তৈরি করছে, এটি একটি মিরাকল। আমাদের বেশকিছু ওষুধ কোম্পানি বিশ্বের ওষুধ সম্পর্কিত প্রধান সার্টিফিকেশনগুলো যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ, যুক্তরাজ্যের এমএইচআরএ, ইউরোপের এমা, অস্ট্রেলিয়ার টিজিএ, উপসাগরীয় দেশগুলোর জিসিসি, ব্রাজিলের আনভিসা, দক্ষিণ আফ্রিকার এমসিসি প্রভৃতি সনদ অর্জন করেছে। সবাই না হলেও দেশের অনেক ওষুধ কারখানা আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিস-জিএমপি' নীতিমালা অনুযায়ী ওষুধ উৎপাদন করছে। যারা তা মানছে না, সরকার ও উচ্চ আদালত সেসব কারখানায় ওষুধ উৎপাদন বন্ধ করেছে। এর ফলে কিছু কোম্পানি বাদে বাকি সব কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ মানসম্পন্ন হয়েছে। যার সুফল হিসাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের ওষুধ আজ বিশ্বের ১৬৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। যারা একসময় আমাদেরকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলেছিল, তারা আজ আমাদের দেশ থেকে ওষুধ আমদানি করছে। যারা আমাদের 'মিসকিন' বলে অবজ্ঞা করত, ফার্মাসিস্ট নেই বলে তারা আজ পর্যন্ত তাদের দেশে ওষুধ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং তারাও আজ আমাদের দেশ থেকে ওষুধ আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলেই জনগণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীনতাকে রক্ষা করাও তেমনই প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা এখনো দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নানাভাবে নানা ব্যানারে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারা উন্নত সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক, দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, অগ্রসর বাংলাদেশ চায় না। তারা বাংলাদেশকে পেছনদিকে নিয়ে যেতে চায়। তারা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত ২১ বার হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কারণ, তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যা তারা চায় না। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদের প্রতিহত করতে হবে। এভাবেই আমাদের জাতির পিতা ও অগণিত মুক্তিযোদ্ধা যে স্বপ্ন ও চেতনা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের শুধু একটি দেশ-মানচিত্র-পতাকা-সংবিধান আর জাতীয় সংগীতই দিয়ে যাননি। তিনি আমাদের দিয়েছেন একটি চেতনা বা বিশ্বদরবারে বুক ফুলিয়ে 'বাঙালি' হিসাবে পরিচয় দেওয়ার সাহস। আর দিয়ে গেছেন একটি স্বপ্ন, যে স্বপ্নকে আমরা লালন করব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আমাদের প্রতিটি অগ্রসর কাজের পেছনে মূল প্রেরণা হিসাবে তিনি আছেন এবং থাকবেন। একে পাথেয় করে আমাদের ওষুধ সেক্টর আরও এগিয়ে যাক, এই প্রত্যাশা আমরা বুকে ধারণ করি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশকে ওষুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তাঁর অমিত সাহসী উদ্যোগগুলো সফল হয়েছে। আজ আমরা ওষুধ উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর। সেই সঙ্গে পৃথিবীর সাতভাগের ছয়ভাগ দেশে আমরা ওষুধ রপ্তানি করছি। দুঃখ এই যে, তাঁর নীতিমালা আর উদ্যোগগুলোর এই সাফল্য তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

লেখক: সাবেক পরিচালক, বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক ডিন, ফার্মেসি অনুষদ; সাবেক চেয়ারম্যান, ফার্মেসি বিভাগ; সাবেক চেয়ারম্যান, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ডিন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সফলতা

একেএম আতিকুর রহমান

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে দেশটির নেতৃত্বের রাজনৈতিক দর্শন এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণের ওপর। পররাষ্ট্রনীতির সফলতার জন্য শুধু শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করলেই চলবে না, এর সফল বাস্তবায়নের জন্য চাই শক্তিশালী নেতৃত্ব। অর্থাৎ, পররাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান। একটি রাষ্ট্রের জন্য এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা ও স্থায়িত্বের ওপরই নির্ভর করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা এমনটি দেখে আসছি।

পররাষ্ট্রনীতিকে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও তার অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন হিসাবে দেখে। প্রকৃতপক্ষে পররাষ্ট্রনীতি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন নীতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে অন্য দেশে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার একটি অভিক্ষেপ। বিশ্বসম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূলনীতি।

মূলত যে কোনো দেশেরই পররাষ্ট্রনীতিতে সেই দেশের নেতৃত্বের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমেরিকার রাজনীতি বিশেষজ্ঞ জেমস এন রোজনোর মতে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রকৃতি এবং সেখানে যে লক্ষ্যগুলো অনুসরণ করতে হবে, এ সম্পর্কে একজন নেতার বিশ্বাস, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও দুর্বলতা, তাঁর অতীত পটভূমি এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা, মানসিক চাহিদা এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য–এগুলো বৈদেশিক নীতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারার কয়েকটি

কারণ। একটি নেতৃত্বের রাজনৈতিক দর্শন ও মতাদর্শ, একটি দেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের বিবেচনায় নেতৃত্বের প্রায়োগিক সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণে নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি ও দক্ষতা প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের প্রণীত পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি শক্তিশালী, বাস্তব ও টেকসই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী নেতৃত্বই পারে তাঁর দেশকে একটি শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি দিতে। আর একটি শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশের জন্য সফলতা এনে দিতে পারে তার পররাষ্ট্রনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যে কোনো রাষ্ট্রের জন্যই এসব বিষয়ের সমন্বয় ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাফল্য পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মূলত পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উভয়ই থাকে নেতৃত্বের হাতে। আর এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের প্রকৃতি ও মাত্রাই একটি দেশকে তার গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে। স্পষ্টতই, উল্লিখিত প্রকৃতি ও মাত্রা একটি দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে এবং এটি বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। তবে প্রধান প্রভাবটি সরকারের আচরণের পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণমান থেকে আসে। এটা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, বিশ্বের সব দেশের, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্যই চরম বাস্তবতা। বাংলাদেশের সৌভাগ্য ছিল যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এক মহান নেতার নেতৃত্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এত বছর পরও তাঁর দেওয়া সেই নীতি অত্যন্ত আধুনিক, প্রাসঙ্গিক এবং রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষায় বাস্তবিক প্রয়োজনীয় হয়ে অনুশীলন হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত হলে মুজিবনগর সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারির হিমশীতল সকালে লন্ডনে পৌঁছান। লন্ডনে পৌঁছানোর পরপরই তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সমর্থনকারী স্বাধীনতাকামী দেশ ও জনগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, 'আমি সেই সমস্ত স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেছে, বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণসহ সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ, যারা আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল।' এ সময় সেখানে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে দুটি আবেদনও করেছিলেন–প্রথমটি ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে তাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং এই সদ্যোজাত দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দ্বিতীয়টি ছিল অবিলম্বে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন করা। সেদিন বঙ্গবন্ধু এই বলে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি টেনেছিলেন, 'আমি আবারও জোর দিয়ে বলছি যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্তিত্ব একটি তর্কাতীত বাস্তবতা এবং অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক এই মৌলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে হতে হবে।'

৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তাঁর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। দুই নেতা প্রায় এক ঘণ্টা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ জানান। কমনওয়েলথের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মি. আর্নল্ড স্মিথ হোটেলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলে সেদিনই বঙ্গবন্ধু তাঁর কাছে বাংলাদেশের কমনওয়েলথে যোগদানের ইচ্ছাটি ব্যক্ত করেন। সেই ছিল বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক যাত্রার সূচনা, যদিও তখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরলেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতের রাজধানী দিল্লি হয়ে। দিল্লিতে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীসহ মন্ত্রিপরিষদের অনেক সদস্য এবং লাখো ভারতবাসী। দেশের মাটিতে পা রেখেই দেখলেন চারদিকে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোনো অর্থ নেই। অথচ তাঁর সোনার বাংলাদেশ যে গড়ে তুলতেই হবে। সেই স্বপ্নেই বিভোর ছিলেন তিনি। এক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে কঠিন দায়িত্ব সেদিন তিনি নিয়েছিলেন বা জাতি তাঁকে দিয়েছিল, তা একমাত্র তাঁর মতো অসম সাহসী দেশপ্রেমিক নেতার পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। আত্মপ্রত্যয়ী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেই মানুষটি কালবিলম্ব না করে দেশকে পুনর্গঠনের মহান কাজে নেমে পড়লেন।

১৪ জানুয়ারি ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁর প্রথম পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশ সরকার 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'–এই পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী। সেদিন তিনি বাংলাদেশকে 'প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড' বানানোর লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, ওই শব্দগুলোই বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি তৈরি করেছিল। বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, বাংলাদেশ থাকবে জোটনিরপেক্ষ। ওই বিবৃতিতে তিনি পিকিং সরকারকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের জন্য রচিত হলো সংবিধান। আর সেই সঙ্গে প্রণয়ন করা হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, যার প্রতিটি শব্দে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা আর দূরদৃষ্টির ব্যাপ্তি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক কথা–'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' এবং 'বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান'-এর ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে দৃঢ়তর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫-এ বর্ণিত বিধানগুলো অনুযায়ী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেই নীতিগুলোর ভিত্তিতে: ১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে; ২. জনগণের প্রত্যেককে তার নিজস্ব স্বাধীন পছন্দের উপায় এবং মাধ্যমে স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের অধিকার বজায় রাখবে এবং ৩. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা বা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ন্যায্য সংগ্রামরত সারা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে সমর্থন করবে। বঙ্গবন্ধু শুধু নিজের দেশের মানুষের কল্যাণের কথাই ভাবেননি। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন সারা বিশ্বের নিঃস্ব ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বিশ্বটা দুভাগে বিভক্ত–শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতদের দলে।' বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ধর্ম বা বর্ণের

পররাষ্ট্রনীতিকে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও তার অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন হিসাবে দেখে। প্রকৃতপক্ষে পররাষ্ট্রনীতি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন নীতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে অন্য দেশে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার একটি অভিক্ষেপ। বিশ্বসম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূলনীতি

মানুষের ওপর শোষণ বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি কখনো দ্বিধা করেননি। মূলত বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন বিশ্বনেতা, যিনি সব সময়ই শোষিতদের পক্ষে কথা বলতেন। তাঁকে তুলনা করা হতো হিমালয়ের সঙ্গে। তিনি আফ্রিকায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং অবসান চেয়েছেন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের। বঙ্গবন্ধু যেমন ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, তেমনই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সাইপ্রাস সরকারকে উৎখাতের নিন্দাও জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর বিদেশ সফর শুরু হয় ভারত সফরের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সফরে যান। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। একটি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান কখনোই অন্য দেশ সফরকালে সেই দেশের জনগণের উদ্দেশে জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই বিরল উদাহরণ সৃষ্টিকারী নেতা ছিলেন, যিনি কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ডে জনতার এক মহাসমুদ্রে বক্তৃতা করেছিলেন। সফরকালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থান করা সব ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ভারত পহেলা মার্চ বাংলাদেশ থেকে তার সব সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং ১৫ মার্চের মধ্যেই প্রত্যাহারের কাজ সমাপ্ত করে।

২৯ ফেব্রুয়ারি পাঁচদিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে বঙ্গবন্ধু মস্কোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। মস্কো সফরকালে তিনি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। ওই সফরে দুই দেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং শান্তিবিষয়ক একটি চুক্তি সই হয়। লন্ডনে চিকিৎসাকালে বঙ্গবন্ধু ১৮ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অপারেশন-পরবর্তী বিশ্রামের জন্য ২১ আগস্ট লন্ডন থেকে তিনি সুইজারল্যান্ড সরকারের অতিথি হয়ে জেনেভা যান। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর ১৩ সেপ্টেম্বর সেখান থেকে দেশে ফেরার পথে নয়াদিল্লিতে যাত্রাবিরতিকালে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আইএমএফ (১৭ মে), আইএলও (২২ জুন), আন্তসংসদীয় ইউনিয়ন (২০ সেপ্টেম্বর), ইউনেস্কো (১৯ অক্টোবর), কলম্বো প্ল্যান (৬ নভেম্বর) এবং গ্যাটের (৯ নভেম্বর) সদস্যপদ লাভ করে। ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে আবেদনপত্র পাঠায়। দুদিন পর বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যকে বাংলাদেশের আবেদনকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করে পত্র লেখেন। ২৩ আগস্ট যুক্তরাজ্য, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়া মিলিতভাবে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করে। তবে চীন সেই প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ৩০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটি সুপারিশ করে।

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ ভিয়েতনামে আমেরিকার বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবি জানায়। ১০ অক্টোবর জার্মানির বার্লিনে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সমাপ্তি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের প্রত্যাবাসনের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমকে পত্র লেখেন। পরের দিন একই ব্যাপারে তিনি রেড ক্রসের প্রেসিডেন্টের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। এদিকে ২৩ নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে শান্তি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি প্যারিসে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গবন্ধু আশা প্রকাশ করেন, এতে শুধু ভিয়েতনামে নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরকালে গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী জেমাল বিজেডিক চারদিনের জন্য বাংলাদেশ সফরে আসেন ২৫ মার্চ। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট জোসিপ ব্রজ টিটোর আমন্ত্রণে ২৬ থেকে ৩১ জুলাই যুগোস্লাভিয়া সফর করেন। সফরকালে প্রেসিডেন্ট টিটো ন্যাম ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যলাভের ব্যাপারে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানান।

বঙ্গবন্ধু অটোয়ায় ২ থেকে ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে কানাডা সফর করেন। তিনি তাঁর সূচনা বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, বেঁচে থাকা এবং শান্তিতে, উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেরই স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ আগ্রহ থাকে।...আমরা কি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখার জন্য আমাদের সব প্রচেষ্টার ঐক্য ঘটাতে পারি না?' ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু।

সেসময় তিনি বাদশাহ ফয়সাল, প্রেসিডেন্ট টিটো, প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, প্রেসিডেন্ট ইদি আমিন, প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি, প্রধানমন্ত্রী তাকেদ্দিন শ্লথ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু ১৮ অক্টোবর সাতদিনের এক সফরে টোকিও যান। ওই সফরে তিনি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জাপান থেকে দেশে ফেরার পথে তিনি স্বল্পসময়ের জন্য মালয়েশিয়ায় যাত্রাবিরতি করেন এবং দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে যেমন ভালোবাসত, বঙ্গবন্ধুও তেমনই তাদের ভালোবাসতেন। তাই তিনি পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত প্রত্যাবাসনের জন্য এপ্রিলে জাতিসংঘের মহাসচিবকে বার্তা পাঠান। ২৮ মে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার বাংলাদেশ সফরে এলে বঙ্গবন্ধু তাঁকেও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ২৮ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ বাঙালি ও পাকিস্তানির প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধু চুক্তিটিকে অভিনন্দন জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ বাঙালিদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৬৮ জন বাঙালির প্রথম দলটি বাংলাদেশে ফিরে আসার মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের কাজ শুরু হয়।

ওই বছর বাংলাদেশ এডিবি (১৮ ফেব্রুয়ারি), আইসিএও (২৮ ফেব্রুয়ারি), ইকাফ (২৩ এপ্রিল) এবং ফাও (১২ নভেম্বর)-এর সদস্যপদ লাভ করে। মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের তিনদিনের এশীয় কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধুকে শান্তির জন্য 'জুলিও কুরি' স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। ১০ জুলাই পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করে। বাংলাদেশ মোজাম্বিকে পর্তুগালের নৃশংসতার তীব্র নিন্দা জানায়। বাংলাদেশ ২১ জুলাই সর্দার মোহাম্মদ দাউদ খানের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। জুলাইয়ে বাংলাদেশ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকেও স্বীকৃতি দেয়। ৩ সেপ্টেম্বর ন্যাম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ন্যামে বাংলাদেশের প্রার্থিতা অনুমোদিত হয়। বঙ্গবন্ধু ৬ অক্টোবর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি মিশর ও সিরিয়ায় এক লাখ পাউন্ড চা পাঠানোর নির্দেশ দেন। আরব সমস্যায় ন্যাম সদস্যদের সমর্থন আদায়ে টিটো এবং বুমেদিনের উদ্যোগকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু মিশর ও সিরিয়ায় একটি করে চিকিৎসকদল পাঠান।

১৯৭৪ সাল শুরুর প্রথম দিনই বাংলাদেশ সফরে আসেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নরম্যান এরিক কার্ক। তাঁর সম্মানে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী কার্ক বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা কঠিন, এমনকি নিষ্ঠুর হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস ছিল। মানুষের অন্তরে বিশ্বাস ছিল। জাতি ধ্বংসাবশেষ থেকে মুক্ত, ঐক্যবদ্ধ এবং উজ্জীবিত হয়ে উঠবে সে বিশ্বাস।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, নিউজিল্যান্ড সেই দিনটির অপেক্ষায় রয়েছে যখন বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হবে। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসিপ ব্রজ টিটো ২৯ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের সংসদে সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিশ্বশান্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু এবং যুগোস্লাভিয়ার ভূমিকার উল্লেখ করেন। এছাড়া ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরে আসেন ওআইসি মহাসচিব। ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরের দিন বঙ্গবন্ধু লাহোরে যান সেখানে অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পথে বাংলাদেশে কয়েক ঘণ্টার জন্য যাত্রাবিরতি করেন।

৮ মার্চ বাংলাদেশে চার ঘণ্টার এক যাত্রাবিরতিকালে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়েরি বুমেদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য মস্কো যান। মস্কো অবস্থানকালে তিনি সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মস্কো থেকে দেশে ফেরার পথে ১০ এপ্রিল তিনি দিল্লিতে ২০ ঘণ্টার জন্য যাত্রাবিরতি করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশ সফরে আসেন মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট ইউ নে উইন। ১২ মে পাঁচদিনের দ্বিপাক্ষিক সফরে বঙ্গবন্ধু ভারত যান। সফরকালে দুই দেশের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি সই হয়। সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেঙ্ঘর ২৬ থেকে ২৯ মে বাংলাদেশ সফর করেন। ওই সময় বাংলাদেশ ও সেনেগালের মধ্যে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পহেলা জুন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থিম্পু যান। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ১৫ জুন পাঁচদিনের সফরে ঢাকা আসেন। ২৭ জুন বাংলাদেশ সফরে আসেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। ৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নগুয়েন হু থু ঢাকায় এক সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। অধিবেশনে অংশগ্রহণকালে তিনি বেশ কয়েকটি দেশের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এছাড়া ২৯ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং করপোরেশন আয়োজিত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চাই। আমরাই আমাদের ভাগ্যের বিধাতা হতে চাই।' ২ অক্টোবর তিনি হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ অক্টোবর ইরাক সফরে যান। ওই মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারও ঢাকা সফরে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ৫ নভেম্বর মিশর এবং ১০ নভেম্বর কুয়েত সফরে যান। কুয়েত সফরকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রায় দুই কোটি ডলার জমা রাখার ব্যাপারে কুয়েতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়। একই মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী হর্স্ট সিন্ডারম্যান ঢাকায় আসেন। ৩ ডিসেম্বর মালয়েশিয়ার রাজা টুংকু আবদুল হালিম মোয়াজ্জাম শাহ ঢাকা সফরে আসেন। ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে যান। সেসময় দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি সই হয়। ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা সফরে আসেন ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক।

১৯ জুলাই বাংলাদেশ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আর্চবিশপ মাকারিয়সের নেতৃত্বাধীন সাইপ্রাস সরকারকে উৎখাতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানায়। বাংলাদেশ ২২ অক্টোবর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম অংশগ্রহণ করেই জাতিসংঘ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কারের দাবি জানায়। বাংলাদেশ আগস্টে ইসলামি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়। নভেম্বরে জাপান এবং বাংলাদেশ যমুনা নদীর ওপর একটি ৩ মাইল দীর্ঘ সেতু নির্মাণের স্থান চূড়ান্ত করে। ১৯ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশকে নামিবিয়াবিষয়ক কমিশনে মনোনয়ন দেয়।

১৯৭৫ সালের ১৯ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হুইটলাম দুইদিনের এক সফরে ঢাকা আসেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি জাতির স্রষ্টাই নন, তিনি একজন মহান নেতাও বটে।' ওই সফরে দুই দেশের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্যসংক্রান্ত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন জাপানের যুবরাজ আকিহিতো। একই মাসে নেপালের রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল নেপাল সফরে যায়। মার্চে ঢাকায় আসেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রেসিডেন্ট। দুদিনের সফরে ১৪ মার্চ ঢাকায় আসেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ। সেসময় দুই দেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি সই হয়। ওই মাসে সিডার প্রেসিডেন্টও ঢাকা সফর করেন। বঙ্গবন্ধু ২৬ এপ্রিল জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টন যান কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য। বাংলাদেশ ১৯ মে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা এবং ২২ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে। ২৩ জুন বাংলাদেশ বিশ্ব খাদ্য পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্ট–মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে ৫০টির মতো রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের সফরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। ওই স্বল্প সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতার নানা বিষয়ে ৭০টির বেশি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করে। অনেক দেশ ও সংস্থা যেমন: সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইডেন, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, আলজেরিয়া, নেদারল্যান্ডস, জাতিসংঘ, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, আইডিএ, ইউএনএইচসিআর প্রভৃতি বাংলাদেশকে কোটি কোটি ডলারের বিভিন্ন ধরনের ঋণ, সাহায্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে।

আমরা জানি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকতেই সৌদি আরব, সুদান, ওমান ও চীন ছাড়া বিশ্বের সব রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেসময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে? এই যে অর্জন, এর পেছনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা এবং বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা যে দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নেতৃত্বে থাকেন, সে দেশের পক্ষেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

আয়তনে ছোটো বাংলাদেশের রয়েছে খুবই কম প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে এর ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব এবং বিশাল মানবসম্পদ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে স্থান করে দিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং সংকটে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় ভূমিকা অন্যান্য দেশ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে দেখে। কারণ, বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সময় আজও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত বৈদেশিক নীতির মৌলিক দিকগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. নুরুল মোমেন, বাংলাদেশ: দ্য ফার্স্ট ফোর ইয়ার্স, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ঢাকা, ১৯৮০।

২. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস (দ্বিতীয় খণ্ড), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৩ থেকে জুন ১৯৭৪।

৩. বাংলাদেশ, নিউজ বুলেটিন (দ্বিতীয় খণ্ড, সংখ্যা-১ এবং ২), বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন, জানুয়ারি ১৯৭২।

৪. বিবিসির রেকর্ড থেকে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২।

৫. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

৬. রোজনো জেমস এন, ডোমেস্টিক সোর্সেস অব ফরেন পলিসি, নিউইয়র্ক, ১৯৬৭।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

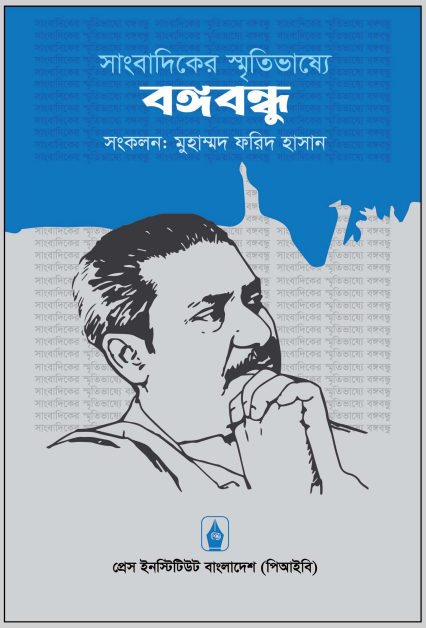

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মোস্তফা হোসেইন

টুঙ্গিপাড়ার মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান একদিন বড়ো মাপের কেউ হবেন, তা তাঁর শৈশবেই আঁচ করতে পেরেছিলেন নিকটজনরা। স্কুলে পড়াকালে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভ তারই ইঙ্গিত বহন করে। কলেজজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মহান নেতার ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সুযোগ তাঁর নেতৃত্ব লাভের পহেলা সোপান হিসাবেই স্বীকৃত।

এরপর ধাপে ধাপে অনেক সিঁড়ি পেরিয়েছেন তিনি। এমন বলার সুযোগ নেই মসৃণ ছিল সেই পথ। হিমালয়সম প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় তাঁকে কৌশলী ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তাঁর কৌশলই তাঁকে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। কখনো তাঁর গৃহীত কৌশলকে মনে হয় রহস্যাবৃত আবার কখনো সরাসরি একেবারে রাখঢাক ছাড়া। যখন যা প্রয়োজন, সেই পথই ধরেছেন তিনি। সফলও হয়েছেন–বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র তাঁর সেই বুদ্ধিমত্তারই সনদ।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের শুরুটা ছিল সাম্প্রদায়িক সংগঠন মুসলিম লীগসংশ্লিষ্ট। মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের নেতা ছিলেন তিনি। মুসলিম ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। ডানপন্থি শাহ আজিজুর রহমান ছিলেন তাঁরই সংগঠনের অপর নেতা। প্রগতিশীল ছাত্রনেতা হওয়ার পরও শুরুতেই তিনি কেন আলাদা হননি কিংবা আলাদা সংগঠন গড়েননি, তেমন প্রসঙ্গও কারও কারও আলোচনায় আসতে পারে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ বিশেষ করে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির প্রয়োজনে শেখ মুজিবকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে। এই ধৈর্য ধারণকে কি কোনোভাবে মনে করা যাবে যে শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ধারণ ও লালন করতেন? এই প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদের পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র বছরকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। লক্ষণীয়, সেখানেও রাজনৈতিক কৌশল

হিসাবে মূল দলের পরিবর্তে ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি করতে হয়েছে তাঁকে। পাকিস্তানের জন্মের পরপর মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো রাজনৈতিক সংগঠনকে জনগণ পাকিস্তানের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করত। কারণ, এই অঞ্চলের মানুষই পাকিস্তান আন্দোলন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল। যে কারণে প্রথমে ছাত্র সংগঠন, এরপর মূল দল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। মূল দল সৃষ্টির পরও মূল দলকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে গড়ার জন্য আরও ছয়-সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এখানে শেখ মুজিবুর রহমানকে দূরদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে আমরা দেখতে পাই। উদাহরণ হিসাবে আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনকালের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি। বলা প্রয়োজন, শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের পালস বুঝতে পারতেন, রাজনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণের দক্ষতাও ছিল তাঁর অপরিসীম। তিনি একাধারে কৌশলী রাজনীতিকের ভূমিকা পালন করেছেন সেই শুরু থেকে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো কৌশল অবলম্বন করতেও দেখা যায় তাঁকে। নিজের আদর্শ অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একেকটি পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন গভীরে ঢুকে। এমন পরিস্থিতিতে হাতের লাঠি হিসাবে মুসলিম শব্দটি গ্রহণ করতে হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মের পর কার্যকর বিরোধী দল হিসাবে প্রথম সংগঠন করার কালে।

তিনি সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী হওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক নামে দল গঠনের বিষয়ে অনেক লেখায় পাওয়া যায়। তবে শেখ মুজিবের কৌশল এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিষয়টি আমরা তাঁর বয়ানে দেখতে পাই, 'আমি মনে করেছিলাম পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে। যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম সময় এখনও আসে নাই।'[১]

রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে তাঁকে বহুবার বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ সৃষ্টির আগেই ছাত্রলীগ গঠিত হয়। সেখানেও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই সময়ের প্রগতিশীল নেতারা চাইছিলেন সরাসরি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হবে। কিন্তু এখানেও শেখ মুজিবকে জনগণের স্পন্দন উপলব্ধি করতে দেখা যায়। আসলে ছাত্রলীগই ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগবিরোধী প্রথম কোনো কার্যকর সংগঠন। শেখ মুজিবুর রহমান এখানে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হন। বুঝতে পেরেছিলেন, ওই সময় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক দল গঠন করে জনমত অর্জন সম্ভব হবে না। তাই ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমেই পাকিস্তানবিরোধী রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এখানে দেখা যায়, তিনি মুসলিম শব্দটি যোগ করেছেন। কিন্তু তাঁর টার্গেট ছিল মূলত অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু তাঁর সহযোগীদের অনেকেই চেয়েছিলেন তখন থেকেই অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তুলবেন। শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছেন; কিন্তু কৌশল ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো। মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনকালে অলি আহাদ সরাসরি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের পক্ষে দাবি করেন। এই প্রসঙ্গে অলি আহাদের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, 'সলিমুল্লাহ হলের ১২ নম্বর কামরায় ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজিং কমিটির সভায় আমি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন করিবার ও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই ইহার সদস্য হওয়ার অধিকার প্রদানের দাবিতে প্রস্তাব পেশ করি। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুর রহমান চৌধুরী ও নঈমুদ্দীন আহমেদের তীব্র বিরোধিতার মুখে আমার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। ওই বৈঠকেই আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে শেখ মুজিবুর রহমান আমার ইস্তফাপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। তাহার গভীর ভালোবাসা, দুর্বলতা ও দরদকে অস্বীকার করার মতো মানসিক শক্তি আমার ছিল না।'[২]

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সূক্ষ্ম চিন্তাশ্রয়ী। তিনি হুট করে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। একই সঙ্গে পরিস্থিতি-পরিবেশ বুঝে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চর্চার প্রধান সোপান। আবার দলীয় নীতি-বিধানকে লঙ্ঘন করে অযাচিত কিছু করার পক্ষেও তিনি ছিলেন না। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শিক সেনানায়ক। তাঁকে তিনি গুরু মানতেন। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণাকালে তিনি দুই কূল রক্ষা করেছিলেন অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে। ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর সদরঘাটে রূপমহল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগকে আওয়ামী লীগ করার প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। বলা চলে, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ গঠনে শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা আবারও অলি আহাদকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

তিনি লিখেছেন, 'ইহা অনস্বীকার্য যে, কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রয়াসে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী মতান্তর ও মনান্তর নিরসনে শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধ।'[৩]

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভিন্নমতকে পরিবর্তন করিয়ে সেদিন অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আওয়ামী লীগ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেন তিনি।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সময় নেন আদর্শিক লড়াইয়ে, যা ছিল অভ্যন্তরীণ ও বাইরের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বাংলার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে যে ছয় দফাকে ইতিহাস স্বীকৃতি দেয়, সেক্ষেত্রে শেখ মুজিবকে লড়াই করতে হয়েছে ভেতরের এবং বাইরের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ছয় দফা আসলে এক দফারই নামান্তর। এর অর্থ সবাই তখনই বুঝতে পেরেছিলেন। যে কারণে ছয় দফা ঘোষণার সঙ্গে ভেতরে-বাইরে ভূকম্পনের মতো তোলপাড় হয়। ছয় দফা ঘোষণাকে পাকিস্তানের ইতিহাসে রাজনৈতিক অ্যাটম বোমা হিসাবে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে। সেখানেও দুর্ধর্ষ ভূমিকা নিতে দেখা যায় শেখ মুজিবকে। একটি দেশের ভেতরে থেকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়াটা যে কত বড়ো সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, তা রাজনীতির যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বোঝা সম্ভব। একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের পরই তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যে এক দফার লক্ষ্যে সেদিন ছয় দফা দিয়েছিলেন, এরও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, "ছয় দফা ঘোষণার পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ-এর পূর্ব পাকিস্তান প্রধান অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি এই যে ছয় দফা দিলেন তার মূল কথাটি কী?' আঞ্চলিক ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন শেখ মুজিব: 'আরে মিয়া বুঝলা না, দফা তো একটাই। একটু ঘুরাইয়া কইলাম।"[৪]

ছয় দফার আড়ালে এক দফাকে কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরের অনেক নেতাও মেনে নিতে পারেননি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যদি বেঁচে থাকতেন, তিনিও আদৌ মেনে নিতেন কি না সন্দেহ আছে।

পাকিস্তানের এক যুগ পেরিয়ে যাওয়ার আগেই তিনি জনগণের চোখের সামনে স্পষ্ট করে দিতে পেরেছিলেন, এই পাকিস্তান আমাদের নয়। আমাদের ভূমি, আমাদের দেশ; আমাদের ভাষা, রাষ্ট্রের ভাষা–সবই হবে এই বাংলার আর তাতেই বাঙালি হবে স্বাধীন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছয় দফাকে 'সিআইএ-এর দলিল' বলেও আখ্যায়িত করেন। কিন্তু নেতা শেখ মুজিব বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সবদিক সামাল দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। ছয় দফার ধারাবাহিকতায়ই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হলো, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে আগরতলা সমঝোতা চুক্তিকে কেন্দ্র করেই। এর পথ ধরেই শেখ মুজিবুর রহমান, শেখসাব, মুজিব ভাই থেকে বঙ্গবন্ধু হলেন।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে–শেখ মুজিব শক্তিশালী পাকিস্তানি জান্তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন কীসের বলে? বলাবাহুল্য, পাকিস্তানের এক যুগ পেরিয়ে যাওয়ার আগেই তিনি জনগণের চোখের সামনে স্পষ্ট করে দিতে পেরেছিলেন, এই পাকিস্তান আমাদের নয়। আমাদের ভূমি, আমাদের দেশ; আমাদের ভাষা, রাষ্ট্রের ভাষা–সবই হবে এই বাংলার আর তাতেই বাঙালি হবে স্বাধীন। কিন্তু এত সহজেই কি মুক্তি চলে আসবে? দুটো পথ তাঁর সামনে–এক. সশস্ত্র বিপ্লব; অন্যটি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু শেখ মুজিব দুটির সংমিশ্রণ ঘটালেন। নিয়মতান্ত্রিক বা স্বাভাবিক রাজনৈতিক আন্দোলন তৈরি করলেন আওয়ামী লীগের মাধ্যমে। যাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্ল্যাটফরম বলা হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যও তিনি প্রস্তুতি রেখেছিলেন। সংগত কারণেই এজন্য তরুণদের সহযোগিতা নিতে হলো তাঁর। ১৯৬২ সালে গঠন করলেন নিউক্লিয়াস। ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে দায়িত্ব দিলেন সেই সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য। আজকাল কিছু ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে নিউক্লিয়াসের স্রষ্টা মানতে দ্বিধা করেন। প্রসঙ্গান্তর মনে হলেও এই বিষয়ে মহিউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। মহিউদ্দিন আহমেদের দীর্ঘ লেখা প্রকাশ হয়েছিল প্রথম আলোর ২০১৯ সালের ইদ সংখ্যায়। সিরাজুল আলম খানের স্মরণে প্রথম আলো লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করে তাঁর মৃত্যুর পরপর। তিনি বঙ্গবন্ধু, সিরাজুল আলম খান ও নিউক্লিয়াস সম্পর্কে লিখেছেন, 'বিজ্ঞানে নিউক্লিয়াস বলতে যা বোঝায়, রাজনীতিতে তার রূপ হয়তো আলাদা। এটা এমন একটা প্রক্রিয়া, যাকে একজন বা একটি ছোট গ্রুপ সঞ্চালন করে, নিয়ন্ত্রণ করে। তখন থেকেই জানি, শেখ মুজিব হলেন আসল নেতা।...শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য গোপনে কাজ করে যাচ্ছেন। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করেন, অন্তত প্রকাশ্যে। কিন্তু সিরাজুল আলম খানকে দিয়ে তিনি অনেক কাজ করান। সিরাজ হলেন শেখ মুজিবের ডান হাত।'[৫]

ছাত্রদের এই গ্রুপকে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার পতাকা, জাতীয় সংগীত, স্বাধীনতার ইশতাহার প্রভৃতি সবই করিয়েছেন; যা ছিল রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে হিমালয়সমান বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। প্রতিটি পদক্ষেপই হয়েছে তাঁর নির্দেশে; শুধু তাই নয়, প্রতিটিতে তাঁর অনুমোদনও ছিল। এই যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সেজন্যই তিনি জাতির পিতা হতে পেরেছেন। সেটা বললে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হবে না।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের পালাবদল ঘটায়। আইনগতভাবে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসনভার পাবে, সেজন্য নির্বাচিত এমপিএ এবং এমএনএরা শপথ নেবেন, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু নেতা মুজিবের বুঝতে অসুবিধা হলো না, সেই সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানিরা সেই সুযোগ দেবে না। আবার এই নির্বাচিত সদস্যদের ম্যান্ডেটকে কাজে লাগাতে হলে তাঁদের শপথ নিতেই হবে। বঙ্গবন্ধুর মাথায় আসে বিকল্প ব্যবস্থা। সংসদ ভবন কিংবা গভর্নর হাউজ নয়, শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন জনগণের উপস্থিতিতে খোলা ময়দানে। ইতিহাসের বিরল দৃশ্য সেদিন অবলোকন করল বিশ্ববাসী। কয়েক লাখ মানুষের উপস্থিতিতে নির্বাচিত এমএনএ এবং এমপিএরা শপথবাক্য উচ্চারণ করছেন জনপ্রতিনিধি হিসাবে। তাঁরা শপথ নিলেন আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবেন এই বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে। ওইদিন শপথগ্রহণকারী এমএনএ ছিলেন অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। তাঁর লেখা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা যায়, "৩ জানুয়ারি ১৯৭১। রোববার। সেদিন উত্তাল রেসকোর্স ময়দান। ১২০ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট উঁচু নৌকা আকৃতির মঞ্চ। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান। সামনে উদ্‌বেলিত লক্ষ জনতা। আবেগ উত্তাল। সেদিন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসাবে আমাদের স্থান ছিল সম্ভবত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডানপাশে। বামপাশে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা। বঙ্গভবন নয়। গণভবন নয়। প্রকাশ্যে জনতার সামনে শপথ অনুষ্ঠান। ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সম্ভবত '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের দলবদলের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এ ছিল প্রকাশ্য গণপ্রতিজ্ঞা। সেদিন ওই শপথ অনুষ্ঠানে ধর্মীয় প্রার্থনার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। একই সঙ্গে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটিও সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিলেন সেদিনের জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী জাহেদুর রহিম, অজিত রায়, আব্দুল জব্বার, আবদুর রউফ, আব্দুল গণি বোখারী প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু ছয় দফার প্রতীকস্বরূপ ছয়টি কবুতর বন্দি খাঁচা থেকে উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিলে লাখো জনতার করতালিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। একটি কবুতর উড়ে এসে বঙ্গবন্ধুর উঁচু করা হাতের উপর বসে। এ যেন বন্দি কবুতরের মুক্তি নয়, বাঙালি জাতির মুক্তির প্রতীক। বঙ্গবন্ধু নিজেই জাতীয়তাবাদী স্লোগান দিলেন 'তোমার দেশ আমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো'।"[৬]

এই শপথ অনুষ্ঠানের পেছনে দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধু হয়তো চিন্তা করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার জন্য কীভাবে সকাল-বিকাল সমর্থন বদল করার বিষয়টি। আবার এটাও চিন্তা করতে পারেন, পাকিস্তানি সেনাশাসকরা আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করতে পারে। এমপিএ এবং এমএনএরা জনগণের সামনে শপথ করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে দুর্যোগ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তগুলো যাতে সবার সিদ্ধান্ত হয়, সেই পথটাও খোলা রাখার বিষয়টিও ভাবতে পারেন। আরও দেখার বিষয়, তিনি একসঙ্গে এমএনএ এবং এমপিএদের শপথ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে এককক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টেরও সূচনা করে থাকতে পারেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ লেখককে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু এমন ভাবনা পোষণ করতেন কি না জানি না, তবে বাস্তবতা হচ্ছে–পরবর্তীকালে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের নিয়েই সাংবিধানিক পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং তাদের পরিচিতি হয়েছিল এমসিএ।' সুতরাং মনে করা যায়, বঙ্গবন্ধু শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের এককক্ষবিশিষ্ট সংসদের কল্পনা করেও সম্পন্ন করেছিলেন। যাকে আমরা পাকিস্তানকে বিদায় জানানোর একটি পদক্ষেপ হিসাবেও বর্ণনা করতে পারি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ মার্চের একটি ভাষণ কত বড়ো ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই ভাষণেও তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন, তা যে কোনো বিচারে ইতিহাসের মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত। সেই ভাষণ কোনো লিখিত বক্তব্য ছিল না। আবার ঐতিহাসিক মঞ্চে আরোহণের পূর্বপর্যন্ত তাঁর সহযোগীরা তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি, তাও নয়। বিশেষ করে, যে ছাত্ররা ছিল ওই সময়ের আন্দোলনের প্রাণশক্তি, সেই ছাত্ররা ৭ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেননি, আবার তাঁদের কথা অনুযায়ী সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণাও দিলেন না। অথচ মানুষ বুঝে গেল যুদ্ধ করতে হবে, পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করতে হবে। দেশকে পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সঙ্গে দলকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে অভিযুক্ত হওয়ার পথ থেকেও রক্ষা করলেন। তিনি জানতেন, পাকিস্তানিরাও বুঝতে পেরেছে, ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণার কিছু বাকি নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে তারা আখ্যায়িত না করলেও ওদের হাত থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যাবে না। আর সেজন্য সশস্ত্র যুদ্ধেরও বিকল্প নেই।

ইতিহাস বলে, সেই ব্যবস্থা তিনি আগরতলা সমঝোতা চুক্তিতেই সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে মাত্র। এবার অস্ত্র সংগ্রহের পালা, প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়া প্রয়োজন। এর জন্য সময় প্রয়োজন। তিনি সময় নিতে থাকলেন। ৭ মার্চে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এবারের কৌশল এর চেয়ে কম নয়। স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে তিনি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। কর্মীদের প্রস্তুত করার জন্য তাঁর প্রধান রাজনৈতিক সৈনিক তাজউদ্দীন আহমদ ও সিনিয়র নেতাদের পথপ্রদর্শন করতে থাকলেন। ছাত্রনেতাদের পরিচালনা করতে থাকলেন। যা আওয়ামী লীগের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না, তার অধিকাংশই করাতে থাকলেন ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে। যার প্রতিফলন দেখা যায় স্বাধীন বাংলার পতাকা, স্বাধীনতার ইশতাহার, জয় বাংলা বাহিনী, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের সমাবেশ থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজে। মুক্তিযুদ্ধের এসব ধারা নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো কম আলোচিত রয়ে গেছে। অস্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতি বিষয়টিও তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারই প্রমাণ। এদিকটি কম আলোচিত থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি কখনো কখনো বলে–শেখ মুজিব পাকিস্তানের নেতা হতে চেয়েছেন কিংবা শেখ মুজিব আসলে মুক্তিযুদ্ধ চাননি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দূরদর্শী এক নেতা। তিনি জানতেন সোজা আঙুলে ঘি তোলা যায় না। সর্বশেষ লড়াইটা অস্ত্র দিয়েই করতে হবে। এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা জরুরি। সেভাবেই তিনি পদক্ষেপ নিলেন। সময় ও কৌশল সেদিকে গোটা জাতিকে নিয়ে যায়। সেনাশাসক ইয়াহিয়াসহ পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনার খবর দুনিয়াজুড়ে প্রচার হতে থাকল; কিন্তু নির্দিষ্ট কর্মীদের তিনি দায়িত্ব দিলেন অস্ত্র সংগ্রহে। এই প্রসঙ্গে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত এমএনএ, সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক আবু সাইয়িদের বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তিনি লিখেছেন, 'শপথ অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের মধ্যে আমি এলাকায় চলে যাই। সম্ভবত ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। আমি তখন বেড়া বাজারে অবস্থিত পাট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মাঙ্গিলাল বাবুর গদিঘরে বসে দেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সেখানে আবদুর রাজ্জাক ভাই (স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান)। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু বলেছেন জয়পুরহাটের পাঁচবিবি যেতে। কিছুই বুঝলাম না, কেন যেতে হবে সেখানে। বললাম আপনি যান। রাজ্জাক ভাই বললেন, দেশ স্বাধীন করতে হবে গণযুদ্ধ করে, বঙ্গবন্ধু তাই ভাবছেন। এই কথা শোনার পর রাজ্জাক ভাইয়ের সঙ্গে জিপে চড়ে বসি। এরপর শাহজাদপুরের এমপি আব্দুর রহমানকে খুঁজে বের করা হলো। আমরা একসঙ্গে পাঁচবিবির দিকে রওয়ানা হলাম। মাঝখানে রাজ্জাক ভাই আমাদের জয়পুরহাটে আবুল হাসনাত এমপিএ-এর বাড়িতে রেখে হিলি বর্ডারের দিকে একাই চলে গেলেন। ওখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় হিলি বর্ডার। ঘণ্টা দুই পরে তিনি ফিরে আসেন। গাড়িতে রাজ্জাক ভাই বললেন, কিছু এক্সপ্লোসিভ আসবে। নগরবাড়ি ঘাটে রাখতে চাই। রাজ্জাক ভাইসহ নগরবাড়ি ঘাটে আসি। ওখানে বৃন্দাবন বাবুর দোতলা ভবনের নিচতলায় এক্সপ্লোসিভ রাখার কথা হয়। বুঝতে পারলাম বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্জাক ভাই বললেন, সিরাজগঞ্জের এমপিএ ডা. আবু হেনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। পরে জেনেছি আবু হেনাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল চিত্তরঞ্জন সুতার এমপিএ-এর কাছে। বঙ্গবন্ধু তা জানতেন। ২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক এবং পরবর্তীতে সিভিলিয়ান উপদেষ্টা কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন।'[৭]

অস্ত্র সংগ্রহ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য জন্য সময়ের প্রয়োজন। অন্যদিকে পাকিস্তানি জান্তাদেরও জানিয়ে দেওয়া দরকার আমরা আর তোমাদের সঙ্গে নেই। স্বাধীনতার বিষয়টি সরাসরি বলার পরিবেশ তখনও হয়নি। আবার বুঝিয়েও দিতে হবে আমরা স্বাধীনতা চাই। অন্যদিকে যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে, সেই জনগণকেও সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। সবকিছুর জন্য বঙ্গবন্ধু সময় চাইলেন। সেখানে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করলেন তা দেখার বিষয়।

মার্চে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য ঢাকায় এলেন। মুজিব তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন না। বৈঠকে বসলেন, একের পর এক বৈঠক চলল; কিন্তু বৈঠকে মুজিবের বক্তব্য একই। সংগত কারণেই আলোচনা সফল–এমনটা বলা চলে না। আলোচনা যে ব্যর্থ হবে, সেটা সবাই জানত। কারণ, পাকিস্তানি জান্তা কখনো মুজিবের দাবি তথা বাঙালির স্বাধিকারের দাবি মেনে নেবে না। ছয় দফাও নয়। সোজা আঙুলে ঘি তোলা যায় না, সেই দিকটিও খেয়াল রাখলেন মুজিব।

বাংলার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে যে ছয় দফাকে ইতিহাস স্বীকৃতি দেয়, সেক্ষেত্রে শেখ মুজিবকে লড়াই করতে হয়েছে ভেতরের এবং বাইরের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ছয় দফা আসলে এক দফারই নামান্তর। এর অর্থ সবাই তখনই বুঝতে পেরেছিলেন

বৈঠক থেকে বেরিয়েই তিনি জনগণকে বললেন, আলোচনা ব্যর্থ। এর মানে তোমরা প্রস্তুত হও। সেই বার্তা তিনি প্রতিদিনই জনগণকে দিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল লোহানীর স্মৃতিচারণামূলক লেখা উদ্ধৃত করা যায়, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বান জানালো সংলাপের টেবিলে। তিনি বসলেন, কিন্তু প্রতিদিন বৈঠকের ব্যর্থতা জানালেন স্থানীয় সাংবাদিকদের। বাংলার অমিত তেজ জনগণ স্লোগান ধরলেন–বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো এবং পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা।'[৮]

একদিকে আলোচনা, আরেকদিকে প্রস্তুতি। অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর ডান হাত হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি কখনো বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি সহযোগিতা করা, কখনো মাঠের রাজনীতিকে পরিচালনা করার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশল বাস্তবায়নে প্রধান সেনাপতি হিসাবে তাজউদ্দীন আহমদ নিয়ামক ভূমিকা পালন করেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে রাজনীতির গতি নির্ধারণ হতে হতে একসময় জনগণ গর্জে উঠলেন, 'গোলটেবিল না রাজপথ রাজপথ, পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ছলনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো আর তিনি পিন্ডির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলেন।...বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করল। কিন্তু গ্রেফতারের আগের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে গেলেন'।[৯]

শেখ মুজিবুর রহমানের বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। এগুলো দুয়েকটি উদাহরণমাত্র। টুঙ্গিপাড়ার দুরন্ত কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বনেতা হওয়ার পেছনের বড়ো শক্তি হচ্ছে তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা। তাঁর ভাবনাগুলো লোকচক্ষুর সামনে যেভাবে ধরা দিত, সেই ভাবনা কিংবা ইচ্ছাপূরণে পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতির জন্য তাঁকে চারদিকে কাজ করতে হতো। করতেনও তিনি। যে কারণে তাঁর পক্ষে বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হওয়া সম্ভব হয়েছে। সবদিক সামাল দেওয়ার যে বুদ্ধিমত্তা, এর পেছনে বড়ো শক্তি হিসাবে কাজ করেছে তাঁর দেশাত্মবোধ এবং জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা; একই সঙ্গে তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ১২১
২. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, অলি আহাদ, পৃ. ৬৪
৩. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, অলি আহাদ, পৃ. ২০১)
৪. স্বাধীনতার ৫০ বছর: শেখ মুজিব যেভাবে নেতা হয়ে ওঠেন ছয় দফা ঘোষণা করে। মিজানুর রহমান খান, বিবিসি বাংলা, লন্ডন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৫. সিরাজুল আলম খান ও স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস, মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রথম আলো, ইদ সংখ্যা ২০১৯
৬. তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, রাজনীতিবিদদের স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু–সম্পাদক, মোস্তফা হোসেইন, পৃ. ৮৮
৭. তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, রাজনীতিবিদদের স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু, সম্পাদক-মোস্তফা হোসেইন, পৃ. ৯০-৯১
৮. কারাগারের ক্যাপ্টেন, কামাল লোহানী। স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু, সম্পাদক–মোস্তফা হোসেইন, পৃ. ২১
৯. প্রাগুক্ত

লেখক: সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক

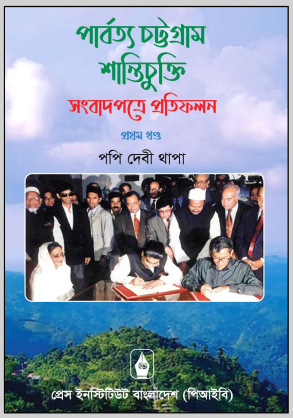

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভাবনা

ড. মো. নাছিম আখতার

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো শিক্ষানুরাগী হওয়া। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মন ও মননে একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। শৈশব ও কৈশোরে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে হাজারো চড়াই-উতরাই, বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। বাস্তবিক অর্থে চিন্তার গভীরতা ও স্বচ্ছতা যাঁর আছে, তিনি পৃথিবীটাকে দেখেন তাঁর দীপ্ত মানসচক্ষে। কালো অক্ষরের জাদুতে লিপিবদ্ধ করেন তাঁর চিন্তার পৃথিবীকে। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, আমার বাবা যদি রাজনীতি না করে শুধু লেখালেখি করতেন, তাহলে হয়তো সেরা লেখকদের সারিতে স্থান করে নিতেন। এত সুন্দর, সহজসরল, সাবলীল তাঁর ভাষা, যার তুলনা হয় না।'

দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি পায় মুক্তির স্বাদ। কিন্তু বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক মুক্তিই শেষ কথা ছিল না। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিকে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য দরকার ছিল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিসহ আরও অনেক কিছু। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলোর সূচনা করে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ছিল সুনিপুণ। তিনি সব সময় শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর ভাবনায় ছিল মৌলিকত্ব, নতুনত্ব, বিচক্ষণতা, সৃষ্টিশীলতা, দেশের মেধাচর্চাকে এগিয়ে নেওয়ার ব্রত এবং দেশের মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শিক্ষিত করার কৌশল।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নামক ছোট্ট ভূখণ্ডে সাত কোটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও কর্ম নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক মুক্তিই শেষ কথা ছিল না। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিকে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য দরকার ছিল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিসহ আরও অনেক কিছু। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলোর সূচনা করে গিয়েছিলেন

গুরুত্বারোপ করেন। পৃথিবীতে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশের উন্নতির কারণ হলো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই তারা অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করেছে। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অনেক আগেই। তাই স্বাধীনতার পর তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেন। সেলক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। যার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদা। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমুখী করতে হলে এমন একজন ব্যক্তিকে কমিশনপ্রধান করতে হবে, যিনি হবেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, শিক্ষানুরাগী এবং একই সঙ্গে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কাজে দক্ষ। ড. কুদরত-ই-খুদাকে বেছে নেওয়ার পেছনে বঙ্গবন্ধুর মনে বিজ্ঞানের ভাবনাটি যে প্রবল ছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তৎকালীন সময়ে বিশ্বে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্যোগী করতে জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশন মাধ্যমে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়।

বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তিকে প্রাধান্য না দিলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার জোগান কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। তখন থেকেই তিনি কৃষি গবেষণার উন্নয়নে জোর দেন। ধান গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে আইন পাশের মাধ্যমে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের গবেষণাবান্ধব পরিবেশে গবেষকরা ১৯৭৫ সালে বিনাশাইল, ইরাটম ২৪ এবং ইরাটম ৩৮-সহ নতুন জাতের ধানের উদ্ভাবন করেন। এর আগে ১৯৭৪ সালে গমের উচ্চফলনশীল জাতের নতুন নতুন উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা সফল হন। এর মধ্যে সোনালিকা জাতটি এদেশে গম উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এছাড়াও কৃষি গবেষণার মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার ফল আমরা প্রতিনিয়ত পাচ্ছি। স্বাধীনের পর সাত কোটি জনগোষ্ঠীর খাবার জোগান কঠিন হলেও এখন ১৮ কোটি মানুষের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

আমাদের দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৬১ সালে পাবনা জেলার রূপপুরে। কিন্তু প্রকল্পটি অনিবার্য কারণে স্থগিত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থগিত হয়ে যাওয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০২৫ সাল নাগাদ ২৭টি দেশে ১৭৩টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান। এগুলোর মধ্যে ৩০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই নির্মাণ করা হবে পরমাণু বিশ্বের নবাগত দেশগুলোয়, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করেন। স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠা করেন। সব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেশের বহুমুখী গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিসিএসআইআর-সহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলছে।

দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ রসায়ন সমিতির সম্মেলন উপলক্ষ্যে এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবেন।' বিজ্ঞানীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধু এক শোকবাণীতে বলেন, 'বাংলার কৃতীসন্তান ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক বসুর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। বিজ্ঞান ও মানবতার প্রতি তাঁর অবদান মানুষ চিরকাল স্মরণ রাখবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।' শোকবাণীর এই কথাগুলোর মধ্যেই বিজ্ঞানীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু প্রকৃতপক্ষে একজন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়নের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আধুনিক বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি, এর বেশির ভাগেরই যাত্রা শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই।

লেখক: উপাচার্য, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মরতে পারলাম না

—— মোহাম্মদ মহিউদ্দিন

স্বাধীনতার আগে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার দিকটি দেখতেন তিনি। স্বাধীনতার পরে জাতির পিতা যখন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সরকারি দায়িত্ব পান। বঙ্গবন্ধু যখন রাষ্ট্রপতি পদে, সেখানেও প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসাবে যুক্ত থাকেন। মুজিববাহিনীর হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। রাজনীতির মাঠে তাঁর নাম বডিগার্ড মহিউদ্দিন। কারও কারও কাছে বঙ্গবন্ধুর মহিউদ্দিন।

দীর্ঘ সাত বছর বঙ্গবন্ধুর সরাসরি সান্নিধ্যে ছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা সপরিবারে নিহত হলে খুনিদের রোষের মুখে তিন বছর কারাবন্দি থাকতে হয়। মুক্তির পর মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগে সক্রিয় হন। দুই যুগেরও বেশি সময় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছিলেন একাধিকবার সংসদ-সদস্যও। বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। জাতির পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটানো সাতটি বছরের নানা স্মৃতি নিয়ে নিরীক্ষা'র মুখোমুখি হন প্রবীণ এই রাজনীতিক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন–সাংবাদিক **বনশ্রী ডলি**

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে পরিচয়?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলতে গেলে আমার খুব খারাপ লাগে, কান্না আসে। আর বলতে ইচ্ছে করে না সেসব দিনের কথা। এসব স্মৃতি মনে করে নিজেকে সামলাতে পারি না। লিডারকে এরা হত্যা করেছে, তিনি আমাদের কাছে নেই, এতগুলো বছর পেরিয়েছে; কিন্তু আমার বুকের ভেতরের কষ্টের বছর পার হয়নি। মনে হয় এই তো সেদিন...!

ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে অনেকবার কাছ থেকে দেখেছি। ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখনই পরিচয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (এখন যা জহুরুল হক) থাকি। শেখ শহীদ যে রুমে থাকতেন, আমিও সেই রুমে থেকেছি। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনের সময়টায় মুজিব ভাই বা লিডার বলি। ব্যক্তিগতভাবে লিডারের কাছাকাছি গিয়েছি তখন থেকেই। ছয় দফার আন্দোলন তুঙ্গে। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে। সেই সময়ের ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেবার প্রথম এত কাছাকাছি তাঁকে দেখি; এরপর পরিচয়।

১৯৬৯ সালে আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, জেলখানা থেকে বের হওয়ার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি গিয়েছি, থেকেছি। সকাল হলেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে চলে যেতাম। ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগের সময়টায় উত্তাল রাজনীতির মাঠ। তখন নির্বাচনের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু যেখানে যান সঙ্গে যাই। তবে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকি। আবার ওনাকে বাসায় দিয়ে ফিরে আসি নিজের আড্ডা বা থাকার জায়গায়। তাঁর এই সঙ্গে থাকা, তিনি কোনো আপত্তি করেন না। তিনি আমাকে তখন পছন্দ করতেন বলেই সঙ্গে থাকাটা অনীহা প্রকাশ করেননি। আমিও এটাকে বড়ো কাজ মনে করলাম। তাতে আমার সাহস আর উৎসাহ বেড়ে যায়। এভাবেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। প্রথমদিকে মুজিব ভাই সম্বোধন করেছি, পরে লিডার, এরপর অফিসিয়াল পরিবেশে স্যার সম্বোধন করেছি। এভাবে একটা সময় আমি কখন যে হয়ে গেলাম বঙ্গবন্ধুর মহিউদ্দিন, তা জানি না। তবে তিনি যে কতটা ভালোবাসতেন, তা আমি জানি, সবাই দেখেছে।

সব পরিস্থিতিতেই আমিও তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলাম। একবার লন্ডনে একটা অপারেশনের পর বঙ্গবন্ধুর খুব কাশি হয়। কাশি উঠলে বুকে ও পেটে খুব ব্যথা আর কষ্ট হতো। শ্বাস ফেলতে গেলে বুকে ও পাঁজরের মধ্যে টান পড়ত। কাশির সময়টায় বুকে ও পাঁজরে হাত দিয়ে চাপ দিতে হতো, যাতে কষ্ট কম হয়। তাই বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. নূরুল ইসলামের একার পক্ষে বারবার বঙ্গবন্ধুকে উঠিয়ে এই সহায়তাটা করার শক্তি ছিল না। আমি এগিয়ে গিয়ে সহজেই বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরেছি। সেসময় পালা করে ডিউটি করেছি আমি আর মো. হানিফ ভাই (পরে তিনি ঢাকার মেয়র হয়েছিলেন)।

দেশে ফেরার পর কথা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. নূরুল ইসলামকে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ডাক্তার সাহেব ভালোবাসা দিয়ে সবকিছু করা যায়। মহিউদ্দিন তারই প্রমাণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হয়তো এমন লোক খুঁজে পাওয়া যেত না, যাকে ছাত্র অবস্থায় সে অত্যাচার করেনি। তাকে দেখলে সকলে ভয় পেত, আমি তাকে আদর করে নিয়ে আসি; প্রাণভরে ভালোবাসি, উপদেশ দিই। এই সেই মহিউদ্দিন। তখনকার মহিউদ্দিনের সঙ্গে আজকের মহিউদ্দিনের আকাশ-পাতাল তফাত। আজ আমি যা বলি, সে প্রাণ দিয়ে তাই করে। প্রাণ দিতে বলি, তাই দেবে, বিশ্বাস করুন।'

বনশ্রী ডলি: সত্তরের নির্বাচন প্রসঙ্গ ও বঙ্গবন্ধু...

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: সত্তরের নির্বাচনের আগের সময়টায় তিনি সারা দেশে সভা ও সমাবেশ করেছেন। যেখানেই গিয়েছেন সঙ্গে গিয়েছি। সব মানুষের কাছে ছয় দফার কথা বলতেন, আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট চেয়েছেন। তখন তো সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকায় কঠিন পরিস্থিতি। এখন যেমন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা জনগণের কাছে ভোট চান আর তখন তো পাকিস্তানের বিপক্ষে সারা দেশে তীব্র আন্দোলন চলছে। রাজনীতির হাওয়া গরম, আন্দোলনে সাধারণ মানুষ শামিল হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তখন একদিনও সভা না করে থাকতেন না। আমি সব সময় সঙ্গে। সভায় যা বলতেন, সেটাই তখন জনগণের জন্য পালনীয় নির্দেশ হতো। সভা করতে গেলে সাধারণ মানুষ নেতাকে ছুঁয়ে দেখতে চাইত, হাত মেলানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠত। আমি অনেক সময় কাছে আসতে দিতে চাইতাম না। তখন বঙ্গবন্ধু আমাকে ধমক দিয়ে বলতেন, 'মহিউদ্দিন তুই কাদের বাধা দিস, গ্রামের এই দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যেই আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। এই মানুষগুলো ভালোবাসে বলেই আমি নেতা হয়েছি। ওরা ছুটে আসে আমাকে দেখার জন্য, আমার কথা শোনার জন্য। হৃদয়ের টানে, এই মাটি ও মানুষগুলোর ভালোবাসা আমাকে আন্দোলন-সংগ্রামে সাহস ও শক্তি জোগায়, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা দেয়। সমাজের এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষগুলোকে সামরিক শাসন ও শোষণ থেকে বাঁচাতে হবে। আমার প্রতি তাদের এই বিশ্বাস আর আস্থার প্রতি সম্মান দেখা।' এরপর থেকে আমি আর কাউকে বঙ্গবন্ধুর কাছে আসতে বাধা দিতাম না। সব সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে আসতে পারত।

একটা ঘটনা বলি, ১৯৭০ সাল, সারা দেশে আন্দোলন। একদিন এক যুবক ছুরিতে বিষ মিশিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মারার জন্য বঙ্গবন্ধুর রুমে ঢোকার চেষ্টা করে। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলে আমাকেও ছেলেটি মারতে আসে। যুবকটিকে ধরে মারধর করছি, তখন বঙ্গবন্ধু ওপর থেকে বলছেন, 'কাকে মারছিস এমন করে, দোষটা কী ওর?' সব বলার পর তিনি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে কেন মারতে চাস, মেরে তোর কী লাভ হবে?।' পরে যুবকটিকে পুলিশে দিয়েছি। এ ঘটনা পত্রিকায় খবর প্রকাশ হয়, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চেষ্টা।' পত্রিকায় সেই দুষ্কৃতকারী ও আমার ছবি প্রকাশ হয়েছিল।

সত্তরের নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় লিডারের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সারা দেশে সভা করতেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট চাইতেন। সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকি। তখন ৩২ নম্বরে বাড়ির নিচের একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করেন লিডার। মাঝেমধ্যে ইকবাল হলে আমার নির্দিষ্ট রুমটিতেও থেকেছি। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাই। বঙ্গমাতাও আমার খেয়াল রাখতেন। নির্বাচন হওয়ার পর তো ইতিহাস সবাই জানে। ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সময় সেখানে ছিলাম।

৩ মার্চ পূর্বাণী হোটেলে বৈঠকের পর তো ঢাকা উত্তাল হয়ে ওঠে, ক্রমেই পরিস্থিতি যুদ্ধে রূপ নেয়। একদলের পর আরেক দল আসে, কথা বলেন, ফোন, বৈঠক করেন বঙ্গবন্ধু। ৩২ নম্বরের বাড়ির সামনে ও এলাকাজুড়ে কর্মী-সমর্থক, সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ভিড় করে, দাঁড়িয়ে থাকে; কী হচ্ছে, কী হবে, লিডার কী করবেন?

বনশ্রী ডলি: ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গ...

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: ৭ মার্চের ভাষণের দিন সবদিনের মতোই আমি সঙ্গে ছিলাম। মঞ্চে উঠে পেছনে কাছেই দাঁড়িয়ে। এখন যে এই ভাষণ এত ঢাকঢোল, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও আলোচনা, গবেষণা–তখন তো এই ভাষণে কী বলবেন, আর এরপর কী হবে, তা জানা ছিল না বা আন্দাজ করা যায়নি। তবে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিতে যাওয়ার আগের সময়টাতে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা আসেন, ভাষণে তিনি কী বলবেন, এ নিয়ে আলোচনা করতে। নেতারা সেদিন বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলেন, তখন বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছেন, 'Leave it to me'.

বনশ্রী ডলি: সেদিনের বিশাল জনসমুদ্র? আপনার হাততালির ঘটনা?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: ৭ মার্চ, সেদিন ৩২ নম্বর থেকে সভায় পৌঁছাই আমরা। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল মঞ্চ, চারদিকে মানুষ আর মানুষ, জনসমুদ্র। কোনো দিক না তাকিয়ে লিডার মঞ্চে উঠলেন, সঙ্গে আমি তো আছিই পেছনে। এমনটা হওয়ারই কথা ছিল। আগে থেকেই জড়ো হচ্ছিল মানুষ। লিডার কী বলবেন তা শুনতে। লাঠিসোঁটা, লগি-বৈঠা নিয়ে কয়েকদিন আগে থেকেই মানুষ এসেছে সেখানে। বাংলার জনগণের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন–এমনটাই কথা। তাই সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অপেক্ষা করছিল। জনসভায় লাখ লাখ লোক একদিনে হয়নি। তখন তো যোগাযোগব্যবস্থা এত ভালো ছিল না। দুইদিন আগে থেকেই লোক এসে জায়গা নিয়েছে। তাই চিড়া, মুড়ি ও মিঠাই পোঁটলায় নিয়ে মাঠে এসে বসে আছে মানুষ, রাতদিন পার করেছে। ভাষণ শুরুর পর কখন যে হাততালি দেওয়া শুরু করি, নিজেই জানি না। ঘটনাক্রমে সেদিন আমি ছিলাম, সেটাই সত্য। এই ভাষণ এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন

এই ভাষণের পর বঙ্গবন্ধু কেমন নেতা, দুনিয়া দেখেছে। ৭ মার্চে ভাষণ দেওয়ার পর থেকে তো বঙ্গবন্ধু মুকুটহীন সম্রাট। অফিস-আদালত, ব্যাংক, স্কুল-কলেজ, ট্যাক্স অফিস–কিছুই চলেনি, তাঁর কথায় সবাই কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কী জৌলুস তাঁর ব্যক্তিত্বে আর নির্দেশে। এসব কাছে থেকে দেখেছি। ফোনে নির্দেশ দিতেন আবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেন। পাশের রুমে ছিলাম। এই রুমে এসে পায়চারি করতে করতে আবার বলতেন কিছু কিছু।

বনশ্রী ডলি: ২৫, ২৬ মার্চ; ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী, আপনি তখন...

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: একাত্তর সালের ২৫ মার্চ আর ২৬ মার্চ! কী পার করেছি, কী দেখেছি, কতটা বলব, বলা যায়? সবটা তো নয়!

২৫ মার্চ সারা দিন বঙ্গবন্ধু বাসায় ছিলেন। ৩২ নম্বরের বাসার নিচে ও সামনের রাস্তায় অনেক মানুষ। তিনি নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, মাঝেমধ্যে ফোনে কথা বলেন। বেলা শেষ হয়ে আসে, সামনের মানুষ অনেকে চলে গেছেন। সন্ধ্যার দিকে বঙ্গবন্ধু লোকদের বললেন, 'এই বাসায় যে কোনো সময় পাকবাহিনী আক্রমণ করতে পারে, তোমরা এখানে থেকো না।' যে যার মতো চলে গেল; কিন্তু আমি ও হাজি মোর্শেদ সাহেব থেকে গেলাম। আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমার সাথে মরে লাভ কী? বাইরে থাকলে যুদ্ধ করে একজন পাকবাহিনীকেও মারতে পারলে লাভ হবে।' তা শুনেও আমি আর মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে কোথাও গেলাম না সেই রাতে। নিচতলার অফিস রুমে বসে ছিলাম। বিভিন্ন জায়গা থাকে ফোন আসছে, জানতে চাইছে বঙ্গবন্ধু কোথায় বা কী অবস্থায় আছেন। এরই মধ্যে কারা যেন প্রচার করছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাত ১২টার দিকে ফোন করেন ডা. বি চৌধুরীর বাবা মো. কফিলউদ্দিন চৌধুরী। ফোনটা আমি ধরেছি, অস্থির গলায় জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধুর কী অবস্থা? বললাম, বঙ্গবন্ধু বাসায় আছেন। তিনি বললেন, 'শুনলাম বঙ্গবন্ধুর বাসায় হামলা হয়েছে, তাঁকে গ্রেফতার করেছে, এসব কি মিথ্যা কথা?' কফিলউদ্দিন সাহেবের কথা তখনও শেষ হয়নি। শুনতে পাই গেটের বাইরে গাড়ির শব্দ, গুলি ও চিৎকার। আমি বললাম ফোন ছেড়ে দিন, হামলা শুরু হয়ে গেছে।

দৌড়ে দোতলায় উঠে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনী আসার খবর দিয়ে নেমে আসছি, এরই মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর কয়েকজন ঢুকে বাড়ি পুরোটা পজিশন নিয়ে রাইফেল তাক করেছে; কয়েকজন ওপরে উঠতে শুরু করে। আমাকে সেখান থেকে ধরে এনে নিচের করিডরের বাইরের জায়গায় মারতে মারতে ফেলে দেয়। পিঠ দিয়ে বুট আর বাঁটের আঘাত সহ্য করার চেষ্টা করছি। আমার তো ব্যায়াম করা খেলোয়াড়ের শরীর। তবুও সেই আঘাত সহ্য করার মতো নয়। দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা, চোখ বুজে আসে আমার। ওদিকে হাজি মোর্শেদকে রুমের বাইরের দিকটায় নিয়ে মারতে মারতে ফেলে রাখে (পরে শুনেছি)। তখন তো কেউ কাউকে দেখতে পারছি না। মনে হলো এবার ওরা আমাকে গুলি করে মারবে। একপর্যায়ে আমি মড়ার মতো পড়ে থাকি। এক পা ড্রেনের কাছে, আরেক পা উঠানে। মুখে ফেনা উঠেছে, অনেকক্ষণ নড়াচড়া করছি না; পাকিস্তানি বাহিনীর একজন 'শালা মর গেয়া' বলে চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু আমি সব কথা ও শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চোখ খুলছি না। সেদিন বাড়ির কাজের ছেলে আব্দুল রান্নাঘরের স্টোর রুমে লুকিয়ে ছিল।

পাকিস্তানি সেনারা দোতলায় বারান্দার জানালায় গুলি করেছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। ভেতর থেকে বঙ্গবন্ধু সাউট করে বলছেন, 'Don't fire, Don't fire. I am coming out.'

চোখ খুলতে পারছি না আমি, তবে টের পাচ্ছি, ওরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানি সেনারা সবাই চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মোমবাতি জ্বালিয়ে বঙ্গমাতা নিচে আসেন। তখন কোনোরকমে উঠে দাঁড়াই। বঙ্গমাতা বললেন, 'আপনার ভাইকে নিয়ে গেছে।' বললাম, আমি দেখেছি। বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলে রাসেল, কাজের ছেলে আব্দুল, বঙ্গমাতা ও আমি দোতলায় মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে বাকি রাতটা পার করেছি। ২৫ মার্চের পরদিন আমি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। সারা শহর চুপচাপ, ঢাকা সেদিন মৃত্যুপুরী সবাই জানে। রেডিয়োতে খবর হচ্ছে।

২৬ মার্চ সকালে শেখ কামাল বাসায় আসে। রাতের সব ঘটনা শুনেছে। আলোচনা করে ঠিক হয় এ অবস্থায় বঙ্গমাতা বাসায় থাকাটা নিরাপদ নন। ওনাকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকতেন ডা. সামাদ সাহেব। বাড়ির নাম 'সড়ায়েখাম', যা উর্দুতে লেখা। বাড়িটি পাকিস্তানিরা কখনো হামলা করবে না ধরে নেওয়া হয়। ২৬ মার্চ সামাদ সাহেবের ছেলে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীকে বিপদের দিনে তাঁদের বাসায় নিয়ে যান। সামনের জায়গা দিয়ে যাওয়া যাবে না। যেতে হলে দুই বাড়ির মাঝের দেওয়াল টপকে যেতে হবে। আমি বঙ্গমাতাকে একটি টুল এনে দিই ওঠার জন্য আর দেওয়ালের ওপারে আমি উপুড় হয়ে বসে বলেছি, আপনি আমার পিঠে পা দিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামুন। বঙ্গমাতা আমার পিঠে সম্পূর্ণ ভর না দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যান এবং 'মাগো' বলে উঠেন; তিনি ব্যথা

> প্রথমদিকে মুজিব ভাই সম্বোধন করেছি, পরে লিডার, এরপর অফিসিয়াল পরিবেশে স্যার সম্বোধন করেছি। এভাবে একটা সময় আমি কখন যে হয়ে গেলাম বঙ্গবন্ধুর মহিউদ্দিন, তা জানি না। তবে তিনি যে কতটা ভালোবাসতেন, তা আমি জানি, সবাই দেখেছে

পেয়েছেন। বঙ্গমাতার কষ্টের প্রকাশ এখনো কানে বাজে। দৃশ্যটি চোখে ভাসে। থাক, আজ আর বলতে পারব না (বলতে গিয়ে কাঁদছেন মোহাম্মদ মহিউদ্দিন)!

প্রায় ১৫ মিনিট পর নিজ থেকেই বলতে শুরু করলেন। ২৬ মার্চ সারা দিন শেখ কামাল ও আমি সামাদ সাহেবের বাসায় থাকি। রাতে ৩২ নম্বরের বাড়িতে আমি আর কামাল দোতলায় ঘুমিয়েছি। মাঝরাতে গুলির আওয়াজে ঘুম ভাঙে; পাকিস্তানি বাহিনী বাড়ির গেট ভেঙে ঢুকতে চেষ্টা করছে। আমরা কোনোরকম দেওয়াল টপকে দৌড়াতে থাকি। কিছুটা দূরে থাকতেন ইস্ট পাকিস্তান বেতারের কর্মকর্তা বাহাউদ্দিন চৌধুরী। তাঁর স্ত্রী আইভী চৌধুরী। ভালো সম্পর্ক ছিল দুই পরিবারের। তাঁর বাসায় যাই। পরের রাতটুক জেগে সকালে আবার সামাদ সাহেবের বাড়ি যাই। আমাদের দেখে বঙ্গমাতা কেঁদে ফেলেন। তিনি ধরে নিয়েছেন রাতে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের মেরে ফেলেছে। কিছু সময় যাওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী সামাদ সাহেবের বাড়ির গেটে এসে হাজির। খবর পেয়ে আবারও পেছনের দেওয়াল টপকে কামালকে নিয়ে পালাই। পালানোর সময় বঙ্গমাতা বললেন, 'তোমরা এখানে আর এসো না।' অন্য কিছু ভাবার সময় ছিল না তখন; পূর্বদিকে দৌড়ে কয়েকটা কোয়ার্টারের ভেতর দিয়ে রাস্তা বদলে সোবহানবাগ, কলাবাগানের সরকারি কোয়ার্টার পার হয়ে অনেকটা দূরে চলে যাই আমরা।

বনশ্রী ডলি: এরপর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: এরপর অনেক ঘুরে, লুকিয়ে ভারতের আগরতলায় চলে যাই। সেখানে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে ট্রানজিট ক্যাম্প আগেই গড়ে তোলা হয়, সেখানেই মুজিববাহিনী গঠিত হয়; মুজিববাহিনীর হয়ে ভারতের দেরাদুনের চাকরাতা ক্যান্টনমেন্টে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছি। মুজিববাহিনীকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। সেক্টরগুলোর দায়িত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। মুজিববাহিনীর গেরিলা দলের প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ভারতের জেনারেল উবান, কর্নেল পুরকায়স্থ, মেজর মালহোত্রা। মাসতিনেক ট্রেনিং নেওয়ার পর বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিএলএফ-এর প্রধান হিসাবে আমি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেওয়ার দায়িত্ব পাই। দেশে ফিরে বাহিনী নিয়ে অবস্থান নিই ফরিদপুরের পদ্মার পাড়ে হাট্টাগ্রামে। পরে নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, আড়াইহাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে অপারেশন পরিচালনা করেছি। ওই সময়টায় বিএলএফ-এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবেই সরাসরি যুদ্ধের মধ্যেই ছিলাম।

দেশ তো স্বাধীন হলো; কিন্তু লিডার কই? বঙ্গমাতাসহ পরিবারের অনেকে ধানমন্ডির এক বাড়িতে বন্দি ছিলেন পুরো নয় মাস। মুক্ত হওয়ার পর আরেক বাড়িতে গেলেন। তখনও ৩২ নম্বরে আসেননি। বঙ্গবন্ধু ফেরার পর তাঁরা ৩২ নম্বরের বাড়িতে আসেন। আমার একটাই চিন্তা; লিডার কোথায় কেমন আছেন? আমার কীসের আনন্দ, কীসের বিজয়ের অনুভূতি!

এভাবে ডিসেম্বর মাসটা শেষ হয়ে গেল। কত কথা যে শুনি, লিডার বঙ্গবন্ধুর সত্যি কথাটা কেউ যেন বলছেন না। কারণ, সবাই তখন জানে যে পাকিস্তানে তাঁকে যেখানে আটকে রেখেছিল, এর পাশেই তাঁর কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে। কী হয়েছে তো তখনও জানি না।

বনশ্রী ডলি: দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরলে...

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: ৮ জানুয়ারি ১৯৭২। বঙ্গবন্ধু লন্ডন এলেন। শুনেছি ফোনে তিনি আমার খবর নিয়েছেন। ১০ জানুয়ারি কলকাতা হয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা অফিসার হিসাবে নিয়োগ পাই। ১৯৭৪ সালে তিনি যখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন, তখনও রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা অফিসার হয়েছি। আনুষ্ঠানিক কর্মজীবন বলতে যা বোঝায়। আগে ও পরে সারা দেশ এবং বিদেশে সব সময়ই সঙ্গে ছিলাম আমি। সকাল ৯টার মধ্যে অফিসিয়াল কাজে বের হতেন বঙ্গবন্ধু। আমি তৈরি হয়ে সাড়ে ৮টায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম। তিনি সাধারণত দুপুরের খাবার পুরোনো গণভবনে খেতেন; আবার কখনো বাসায় ৩২ নম্বরে খেতে আসতেন। বাসায় ছোটো ছেলে রাসেল এবং নাতি জয়কে নিয়ে একটু সময় হলেই খেলতেন। আমি সর্বক্ষণই সঙ্গে। লিডারের নিরাপত্তার বিষয়ে আমলা, আর্মি অফিসার, নেতা ও মন্ত্রী কারও কোনো প্রভাব আমার কাছে ছিল গৌণ বিষয়; মুখ্য ছিল লিডারের নিরাপত্তা।

আমার এক বন্ধু ক্রীড়া ম্যাগাজিনে আমার এসব কথা লিখেছে। আমার অফিসে একদিন এসে বন্ধু অনেক গল্প করেছে, বলতে গিয়ে অনেক কথা বলেছি; অনেকের কথার সঙ্গে আমার কথাগুলো লিখেছে। সেখানে অনেক কথা পাবেন। এসব কথা বলতে গেলে খারাপ লাগে।

কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করলেন, রাজহংস সাঁতারু নাম দিয়েছিল। ১৯৬৭ সালে আমি ওয়ার্ল্ড অলিম্পিকে গিয়েছিলাম, তখন

আমাকে রাজহংস সাঁতারু উপাধি দেওয়া হয়। সেটা জেনে এই লেখাটার শিরোনাম দিয়েছে 'রাজহংস সাঁতারু'। দর্জিবাড়ি না কী যেন, আমাকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেল। গল্প শুরু করে। বলতে গেলে কষ্ট লাগে, কান্না আসে, ওরা আমার কান্নাগুলো ভিডিয়ো করেছে। ছবিও তুলেছে।

বনশ্রী ডলি: আপনি তো রাজহংসই ছিলেন, তাই তো বঙ্গবন্ধু আপনাকে এত ভালোবেসেছেন। সবাই জানে আপনি বঙ্গবন্ধুর মহিউদ্দিন, আপনার কেমন লাগে?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: বঙ্গবন্ধুর মহিউদ্দিন কথাটা শুনলে এখন খুব কষ্ট হয়। কারণ, সব সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, এরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে, বঙ্গমাতাকে হত্যা করে। আমি কেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মরতে পারলাম না, এই সময়টাতে কেন আমি থাকতে পারলাম না (অঝোরে কাঁদছেন)।

বলতে শুরু করলেন–সকাল ৮টায় যেতাম ৩২ নম্বরে। সারা দিন লিডারের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি। অফিস, সভা, বৈঠক শেষ করে রাত ১১টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই থেকে বঙ্গমাতার কাছে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরেছি প্রতিদিন। আর সেই রাতে আমি মরতে পারলাম না (বুকের মধ্যে হাত দিয়ে কান্না করেছেন কিছুক্ষণ)। এই কষ্ট কেউ বুঝবে না! আমার বুকের ভেতরে কেমন করে, তা কী করে ব্যাখ্যা করব। সারা জীবনের আফসোস মরতে পারলাম না!

বনশ্রী ডলি: ১৫ আগস্ট প্রসঙ্গ...

মহিউদ্দিন আহম্মেদ: ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট। প্রতিদিনের মতো সকাল ৯টা থেকে লিডার অফিস করেছেন গণভবনে। বিকালে গণভবনে টুকটাক কাজ থাকে; সাধারণত রাজনৈতিক সাক্ষাৎ, আলোচনা, আড্ডা–এসব হয়। যেমন: লিডারের কাছে প্রায় দিনই আতাউর রহমান, মাওলানা তর্কবাগীশ–এমন নেতারা আসতেন। অনেকে আসছেন, সেদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। এমন সময় আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী; আমি স্যার সম্বোধন করি তাঁকে। পরদিন ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, বড়ো অনুষ্ঠান। প্রস্তুতির খবরাখবর এবং লিডার কী বলবেন, এ নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। আমার কাছে জানতে চাইলেন কী অবস্থা? বললাম, কয়েকজন আছেন, কথা বলছেন লিডার। মতিন স্যার বলছেন, 'কাল সকালে অনুষ্ঠান, কী বলবেন তা তো ওনাকে ভাবতে হবে, এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না? আজ যদি এত সাক্ষাৎকার দেন, তাহলে কেমনে হবে?' বললাম, আমি তো স্যারকে বলতে পারি না যে এখন চলেন। তবে কায়দা আছে, তখন স্যার বুঝতে পারেন যে আমি চাই তিনি এখন উঠে আসুক। মতিন স্যারকে বললাম, দেখি কী করা যায়। তিনি বলেন, দেখাও তোমার কায়দা। লিডারকে উঠানোর প্রয়োজন হলে আমি গিয়ে লিডারের কথা বলার জায়গার কাছেই টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি বুঝতে পারেন উঠতে হবে। সেদিন দাঁড়িয়ে আছি; কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকান না। কোনো ইঙ্গিতও করেন না। কিছুক্ষণ পর আমি চলে আসি। মতিন স্যারকে বললাম, আমি তো চেষ্টা করলাম, তিনি তো মনে হয় উঠবেন না এখন। কী করি! প্রথমটিতে ব্যর্থ, দুই নম্বর কায়দা আছে, সেটি করে দেখি পারি কি না। তাঁর একটা টেবিল আছে, তাঁর ওপর একটা চশমা, পাইপ আর তামাকের প্যাকেট থাকে। আমি গিয়ে যদি চশমাটা হাতে নিই, তাহলে তিনি বোঝেন যে এবার উঠতেই হবে। তো আমি গিয়ে তামাকের প্যাকেটে হাত দিয়ে তুলতে গেছি; লিডার তাকিয়ে বলে উঠেন, 'অই থো, রাখ' বলে আবার কথা বলতে থাকেন। বুঝলাম তিনি উঠবেন না। ফিরে আসি। মতিন সাহেব অস্থির হন। কিছুটা সময় যায়। মতিন সাহেব বলছেন, আমারই কিছু একটা করতে হবে। মতিন স্যার কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জোরে জোরে বলে উঠেন, 'মহিউদ্দিন, লিডারের গাড়ি কি রেডি আছে, আমিও জোরে বলি, জি, সব রেডি আছে। বঙ্গবন্ধু মতিন সাহেবের কথাটা ক্যাচ করেছেন; বঙ্গবন্ধু তখন মতিন স্যারকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'আপনিও আমার পিছে লেগেছেন?'

এরপর মতিন সাহেবকে নিয়ে গাড়িতে উঠেন, আমিও সঙ্গে আছি। সেই রাতে ডিনার পার্টি ছিল একটা। তা হলো বঙ্গবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারি মশিউর রহমান (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা) এবং মনোয়ারুল ইসলাম, তখন জয়েন্ট সেক্রেটারি; তারা দুজনেই বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, সেই উপলক্ষ্যে ডিনার পার্টি। এদিকে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন বঙ্গবন্ধু, সেজন্য সিকিউরিটি স্টাফ ও গাড়িকে এক ঘণ্টা আগে আসতে বলেছি এবং অন্য সব খোঁজখবর নিয়ে প্রস্তুতি শেষ করি। এরই মধ্যে শুনলাম জাসদের ছেলেরা এদিক-সেদিক কীসব যেন ককটেল ফুটিয়ে বা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যেন বঙ্গবন্ধু যেতে না পারেন; পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করছে।

রাত ১১টার দিকে লিডারকে বাসায় রেখে বিদায় নিই। এরপর ডিনার পার্টিতে গিয়ে তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে দেখা। কিছুক্ষণ পর দুজনেই বের হয়ে আসি। তোফায়েল সাহেব বললেন, লিডারের সঙ্গে দেখা করে আসি চলেন। বললাম, আপনি যান, আমি ওপরে যাব না। বিদায় নিয়ে চলে এসেছি, এত রাতে এখনো আছি দেখলে বকা দেবেন তিনি। তোফায়েল সাহেব ওপরে গেলেন, আমি নিচে রইলাম। এ সময় গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব এসেছেন। জানতে চাইলেন লিডার কোথায়? বলেছি, ওপরে আছেন। মোস্তফা সাহেব ওপরে গেলেন আর তোফায়েল সাহেব কথাবার্তা বলে নেমে আসেন। তোফায়েল সাহেবের গাড়িতে করে তাঁর ধানমন্ডির বাসায় যাই; তিনি বাসায় যান আর আমি আমার বাসায় চলে আসি। তখন রাত সাড়ে ১২টা বেজে গেছে।

তখন ইস্কাটনে সোনালী, রূপালী নামে সরকারি কোয়ার্টার ছিল; আমি থাকি সোনালীর তিনতলার একটি বাসায়। সঙ্গে থাকে সেন্টু, রঞ্জন, ইকবাল (পরে ইকবাল ডাক্তার হয়েছে)–ওরা কয়েকজন। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঘুমিয়েছি রাত দেড়টায়। শেষ রাতে সেন্টু, রঞ্জন, ইকবাল দরজা ধাক্কা দিচ্ছে আর ডাকছে। আমার ঘুম ভেঙে যায়, তখন গুলির শব্দ পাচ্ছি। দরজা খুলতেই ওরা বলছে গুলির আওয়াজ পাচ্ছেন না? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। মনে হলো যেন ক্রসফায়ারের মতো, দুই পক্ষই গুলি ছুড়ছে। তখনও ধারণা করছি, জাসদের ছেলেরা বোধহয় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। আমার বাসার কাছেই রমনা থানা। ওরা বোধহয় রমনা থানায় গ্রেনেড মেরেছে, হামলা করেছে, যাতে সকালে বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানে যেতে না পারেন। অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। এটা আমার ধারণা। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হামলা হবে, এটা আমার ভাবনার ভেতরে আসেনি, এটা চিন্তায়ও ছিল না। কিছুক্ষণ পর পর শব্দ পাচ্ছি গুলির। কিছুক্ষণ পর সেলিনা হক নামে এক নেত্রী ফোন করে বলছেন, কারা যেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। শুনে এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা মনে হলো না। কিন্তু আমি তখনই ফোন করলাম আলী মেহেদি খানকে। সে ছিল সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার। তাঁকে কলাবাগান সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারে একটা বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম; বঙ্গবন্ধুর বাসাটা কাছেই আছে। যেন সব সময় খবরাখবর রাখতে পারে। তাঁকে ফোন করি, সে ফোনটা ধরেছে। বঙ্গবন্ধুর বাসায় নাকি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে, আপনি জানেন? বলে, স্যার, জানি না। আপনি ইমিডিয়েট দেখেন। আমার এখানে গোলাগুলি হচ্ছে।

৭ মার্চে ভাষণ দেওয়ার পর থেকে তো বঙ্গবন্ধু মুকুটহীন সম্রাট। অফিস-আদালত, ব্যাংক, স্কুল-কলেজ, ট্যাক্স অফিস–কিছুই চলেনি, তাঁর কথায় সবাই কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কী জৌলুস তাঁর ব্যক্তিত্বে আর নির্দেশে

তাড়াতাড়ি দেখেন ব্যাপারটি কী। আচ্ছা দেখছি। পরে আর তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি আমার। এরপরই আমি রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করি, কেউ ফোন ধরে না, পুলে ফোন করি গাড়ি নিয়ে আসার জন্য, কেউ ফোন ধরে না। রাজারবাগে আমাদের নিরাপত্তা স্টাফের কয়েকজন আছেন, তাদের ফোন করি, তারা কেউ ফোন ধরল না। কেবল ফোন ধরেছেন রাজারবাগ পুলের ড্রাইভার। বলছেন, আপনার গাড়ির ড্রাইভার নেই আর আপনার স্টাফরা কেউ নেই। ওরা সব যে যার বাসায় থাকে। এমন সময় তৌফিক ইমাম সাহেব ফোন করে ঘটনা জানতে চেয়েছেন। ওনাকে বলেছি, মনে হয় দুষ্কৃতকারীরা কাল বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াটা পণ্ড করতে চায়। সেজন্য এ কাজ করছে। কিন্তু মনে মনে ভাবছি, এখন কী করি! আমার ব্যক্তিগত একটা ১৭৫ সিসি হোন্ডা আছে। সরকার থেকে কিনে স্টাফদের দিয়েছি। আমিও একটা কিনে রেখেছি। কানাডা গিয়ে দুই রঙের হেলমেট কিনেছিলাম। একটা সাদা, আরেকটা সবুজ। সেই রাতে সবুজ হেলমেট পরে হোন্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। যেন কেউ চিন্তে না পারে। পেছনে বসা ইকবাল। ধানমন্ডির উদ্দেশে রওয়ানা হই। ২৭ নম্বরের ওদিক থেকে ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল পর্যন্ত গেছি। তখনও অন্ধকার। ওখানের গেটে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। অনেকে একবার ভেতরে যায় আবার বাইরে আসে–এমন পরিস্থিতি। আমি গেট ক্রস করতে চাইলাম, ওরা আমাকে থামায়। বলছে, কই যান? হেলমেট পরা বলে চিনতে পারেনি। বলি, সামনে যাব, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি যাব। আমি কে তা বলি না। না, সামনে যেতে পারবেন না, ওখানে রক্ষীবাহিনীর গাড়ি, আর্মির গাড়ি আছে। গোলাগুলি হচ্ছে, শব্দ পান না?

রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। আমি ভাবলাম যে আমি তো বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার, আমাকে তো আর্মি ও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা চিনবেন, ওয়েলকাম করবে তাহলে যাব না কেন। ওদের কথা না শুনে গাড়ি টান দিলাম। যখন সামনে যাচ্ছি, তখন আগুনের গোলা ধেয়ে আসছে। ইকবাল বলছে, গাড়িটা থামান, যেভাবে গুলি আসছে, আমাদের ওপরে পড়বে। ওখানে গেলে না হয় আপনাকে অফিসাররা চিনতে পারবে আপনি কে, গুলি তো আপনাকে চিনবে না। গাড়ি থামাই। ভাবলাম বাসায় যাই। আমার ইমার্জেন্সি টেলিফোন দিয়ে আবারও যোগাযোগ করে আবার আসি। যদি বুঝতে পারতাম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা করেছে, তাহলে সদর দরজা দিয়ে বা যেভাবেই হোক ভেতরে যেতাম। একাত্তরের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি আর্মিরা হামলা করার পর কামালকে নিয়ে পালিয়েছি। সদর রাস্তায় আর্মিরা সেদিন আসা-যাওয়া করে, সেদিন পেছন দিয়ে পালাই। সেদিন এটা ভাবনায় আসেনি যে এমন হামলা করেছে। যদি জানতাম বঙ্গবন্ধুকে মারতে এসেছে, তাহলে মরি আর বাঁচি বাড়িতে ঢুকতামই। গেরিলা ট্রেনিং ছিল আমার। কামালকে যেমন ২৭ মার্চ রাতে নিয়ে পালিয়েছিলাম, তেমনই চেষ্টা করতে পারতাম। এত আর্মির মধ্যে হয়তো কিছু করতে পারতাম না একা, কিন্তু মরতে তো পারতাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে! সব সময় থেকেছি আর তখন মরতে পারলাম না!

বাসায় ফিরে গেলাম। যাওয়ার সময় তো আর কিছু জানতে পারিনি। যেতে না যেতেই ড. ফরাস উদ্দিন সাহেব (বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সচিব) আমাকে ফোন করেন, মহিউদ্দিন কী খবর? বললাম, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা হয়েছে শুনে আমি তো গিয়েছিলাম; কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে পারিনি।

তিনি বলছেন, মহিউদ্দিন আমাদের এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর কাছে থাকা উচিত। আবার বলি, আমি তো গিয়েছিলাম, গোলাগুলির মধ্যে ঢুকতে পারলাম না, কী করি এখন? হঠাৎ ড্রয়িংরুমে রেডিয়ো শোনার জন্য ওরা ডাকছে। সেখানে যাওয়ার পর শুনতে পাই, চেয়ার ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ হচ্ছে রেডিয়োতে। ওরা যে রেডিয়ো অফিসে গিয়ে ধস্তাধস্তি করছে, সেই শব্দগুলো পাচ্ছি। আবার সেই শুয়োরের (শূকরের) বাচ্চা বলছে, 'মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবরকে হত্যা করা হয়েছে।' (কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিউদ্দিন। আর কথা বলতে পারেননি অনেকক্ষণ।)

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর...

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আমি চলে আসি আমার এলাকায় চরের দিকে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। চর মানে পদ্মার পাড়ে। তখন তো সব ছিন্নভিন্ন, মুক্তিবাহিনী বা যুদ্ধ নেই। আগের মতো সংগঠিত নেই আমরা।

ভাবলাম যাব আগরতলায়, কিছু যদি করা যায়। আগরতলা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছি। কিন্তু আমার আগে যারা গিয়েছিল, তারা সব ফেরত এসেছে। আমি যখন যাচ্ছি, ওদের সঙ্গে দেখা; তারা বলছে, ভেতরে গিয়ে লাভ নেই। ওদের কাছে আগের মতো আমাদের মূল্যায়ন বা মর্যাদা আর নেই। যদি কিছু করতে হয় নিজেদেরই করতে হবে। ফিরে আসি। চরে লুকিয়ে থাকি। প্রতিরোধ করতে চাই; কিন্তু অস্ত্রপাতি নেই, লোকজন নেই; কী দিয়ে কেমন করে কী করব। অসহায় অবস্থা।

বনশ্রী ডলি: আপনি কবে গ্রেফতার হন, তারপর?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: চর এলাকা থেকেই মাস দুয়েক পরে ৩০ অক্টোবর আমাকে গ্রেফতার করে। ঢাকা জেলে নেয়। জেলখানায় চার নেতাকে যেখানে রাখা হয় (পরে হত্যা করা হয়), সেই নিউ জেলে আমাকে রাখা হয়। ১ নভেম্বর জেলে নেওয়া হয় আমাকে। ৩ নভেম্বর চার নেতাকে হত্যা করা হয়। নিউ জেলের ১, ২ ও ৩ নম্বরে ছিলেন তারা। আমি ছিলাম দুই নম্বর সেলে, যেখানে কামারুজ্জামান ভাই ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন এক নম্বর সেলে। তিন নম্বর রুমে রাখা হয় ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবকে। আমার রুমের সামনে একটা করিডর ছিল, করিডরটাই রাস্তা। ৩ নভেম্বর, ভোরে জেলের পাগলা ঘণ্টা বেজে ওঠে। কামারুজ্জামান ভাই বললেন, লক্ষণ ভালো মনে হচ্ছে না।' কামারুজ্জামান ভাই বাথরুমে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাবিলদার সাহেব, (মিঞা সাহেব) এসে কামারুজ্জামান সাহেবকে ডাক দিয়েছেন। বাকি সবাই তৈরি হয় বাইরে যাওয়ার জন্য। তখন হাবিলদার বলছেন, শুধু উনি (কামারুজ্জামান সাহেব) যাবেন আমার সঙ্গে। আমার রুম থেকে কামারুজ্জামান ভাইকে এক নম্বর রুমে নিয়ে যায়। কামারুজ্জামান ভাই তারকাঁটার সঙ্গে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা নিলেন, তাঁর হাতটা কেঁপে ওঠে। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে বের হন। তিন নম্বর রুম থেকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবকে বের করে এই রাস্তা ধরেই এক নম্বর রুমে নেওয়া হয়; এক নম্বর রুমের অন্যদের তিন নম্বর রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর বুটের আওয়াজ মনে হলো। একটানা বার্স্ট ফায়ার হচ্ছে মনে হলো, দেখতে তো পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি। মনে হলো বোম্বিং হচ্ছে। এমন মনে হচ্ছে যে বোম্বিং করে পুরো জেলখানা উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা তখন লকআপে। বন্দি আমরা কোথায় যাব? কেউ চৌকির তলে, কেউ বাথরুমে, কেউ নিচে শুয়ে পড়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম আমি। বোম্বিং হচ্ছে, ছাদ ভেঙে মাথায় পড়বে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম মনে নেই। একটা সময় দেখি ছাদ তো মাথায় পড়েনি। চেয়ে দেখি ছাদ তো ঠিকই আছে। বিল্ডিং-ওয়াল সব ঠিকই আছে। এরপর বুঝলাম বোম্বিং হয়নি। সব চুপচাপ। খবর পেলাম চারজনকে মেরে ফেলেছে। ভাবছি এখন আমাদের মারবে, সময় গুনছি কেবল। দুইদিন হয়, ভাত খেতে পারছি না, কখন যে মারবে! কিছু করার ক্ষমতা নেই, হাত-পা খালি, বন্দি হয়ে আছি। এভাবে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সময়টা গুনছিলাম। দুইদিন পর চার নেতার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়। কাউকেই দেখতে দেওয়া হয়নি। জেলে থাকার সময়টায় সেসময়ের সরকার অনেক ধরনের ভয়ভীতি, লোভ, দল পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন বলেছি, যার পায়ের নিচে থেকেছি, সেখানে আছি মনে করেই মরতে চাই। এখন কোনো পদ, লোভ ও ভয়ভীতি দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর পায়ের নিচ থেকে আমাকে সরাতে পারবেন না। সাড়ে তিন বছর পর কারাগার থেকে বের হই।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর জীবনে চারদিক থেকে ঝুঁকি বাড়ছিল, এ নিয়ে অনেকে অনেকবার সতর্ক করেছেন, বঙ্গবন্ধু এসব কানে তোলেননি, কেন? এ নিয়ে আপনি কি কোনো কথা বলেছেন?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: অনেকে হয়তো বলেছে। একটা কথা কী–আসলে কোনো বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে মারতে পারে বা মারবে, এটা বঙ্গবন্ধুর কল্পনাতীত ছিল। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আমিও ভাবিনি। ওনাকে হত্যা করবে? কী করে সম্ভব! কিন্তু সম্ভব করেছে এরা।

দেখুন কীরকম হত্যা, কী নির্মম! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন হত্যার ঘটনা আছে? এত বড়ো জঘন্য ঘটনা? রাষ্ট্রপ্রধানকে মেরে ক্ষমতা দখল করেছে–এমন ইতিহাস দু-চারটা আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, পুত্রবধূদের, শিশু রাসেলকে এবং আত্মীয়স্বজনসহ হত্যা! এ নিকৃষ্টতম ইতিহাস লেখলে শেষ হবে না।

বঙ্গবন্ধু পৃথিবীতে কতটা জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, সেটাও এক ইতিহাস। সারা জীবন বলে শেষ করতে পারব না। আর ভালো লাগছে না বলতে...!

বনশ্রী ডলি: মোশতাক, জিয়াউর রহমান তাদের দেখেছেন?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: দেখেছি, দুজনকেই অনেকবার! জিয়াউর রহমান এসে আমার রুম হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন। কতবার দেখেছি, কথা বলেছি। সে ছিল সেকেন্ড ইন কমান্ড, আর মেজর শফিউল্লাহ ছিলেন এক নম্বর। জিয়াউর রহমান, শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, সাফায়েত জামিল–কার সঙ্গে ভাব না ছিল আমার? এই যে দেখছেন দেওয়ালের ছবিটা, এর মধ্যে একমাত্র হাজি মোর্শেদ আর আমি বেঁচে আছি, অন্যরা বেঁচে নেই। ওই যে আরেকটা, এতে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে আছেন, পিআরও হাসেম সাহেব; ফরেন সেক্রেটারি হারুন চৌধুরী; গোলাম রসুল, এনার সম্পাদক; রফিকুল্লাহ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর সেক্রেটারি, বর্তমান স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর বাবা তিনি; নূর ইসলাম অনু, সিএসপি অফিসার; এরপর আছেন লন্ডনের হাইকমিশনার; প্রফেসর নূরুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক; আরও ছিলেন পিআরও হাসান সাহেব এবং তাদের সঙ্গে আমি।

বনশ্রী ডলি: আপনাকে এত ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু, এতে অন্যদের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখতেন? এ নিয়ে কোনো স্মৃতি মনে পড়ে?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: হিংসা তো কিছুটা করত মনে হয়! কত যে ষড়যন্ত্র, আমাকে এই জায়গা থেকে সরানোর জন্য। এ আরেক ইতিহাস। এই যে ছবিতে দেখছেন। কোরবান আলি, করিম ব্যাপারী, তখন তো তারা আওয়ামী লীগের নেতা। আমি তো ১৯৬১ সালে মুন্সীগঞ্জে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। হরগঙ্গা কলেজের ১১ নম্বর রুমে ছাত্রলীগ গঠন করি। তখন মুন্সীগঞ্জ ছিল সাবডিভিশন, জেলা হয়নি। একবার মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়, কাউন্সিলের নেতা কোরবান আলি, করিম ব্যাপারী, শাহ মোয়াজ্জেম ও হারুন ভাই। করিম ব্যাপারী সভাপতি, হারুন ভাই সেক্রেটারি–তাদের নিয়ে মহকুমা কমিটি। সময়টা ১৯৭০ সাল, গুদারাঘাট এলাকায় দর্পণ সিনেমা হলে কাউন্সিল হয়। তখন আমি ছাত্রলীগ থেকে বের হয়ে পড়েছি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকি সব সময়। কাউন্সিলে যে কমিটি হয়েছে, সেখানে আমাকে কোথাও রাখেনি। এমনকি সদস্য পদেও নয়। কমিটি ঘোষণা করে দিল। কিন্তু হাউজে উপস্থিত দলবল তো আমার পক্ষের, সাংগঠনিক শক্তিও আমার গড়ে তোলা। কে পারে ওদের সঙ্গে। এই কমিটি মানি না বলে চিৎকার দিয়ে প্রতিবাদ জানায় উপস্থিত সবাই। আবার কাউন্সিল হবে, দরজা সব বন্ধ করে দেয়। ভোট হবে; যে যার মতো কনটেস্ট করবেন। আমি হারুন ভাইয়ের সিটে দাঁড়ালাম। আর কোনো পোস্টে কনটেস্ট নেই। ভোট হলো, তিন ভোট পেলেন হারুন সাহেব আর সব ভোট পেলাম আমি। ব্যস, সেই থেকে সাধারণ সম্পাদক আমি। এরপর থেকে একদিকে মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যেতে হতো সব জায়গায়। এভাবে চলছে '৭৫ সাল পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর সাড়ে তিন বছর কারাগারে থেকে বের হই। বের হয়ে একদিন হাজি মোর্শেদের অফিসে যাই; তিনি আমাকে দেখে চেয়ার থেকে আধা উঠে তাকিয়ে থাকেন, সোজা হন না, অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন; 'আপনি!' বলি, হ্যাঁ, বেঁচে আছি, আপনি কেমন আছেন।

এভাবেই রাজনীতি করেছি। ১৯৭৯ সাল থেকে আপ টু ওয়ান-ইলেভেন পর্যন্ত আমিই তো নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছি। মুন্সীগঞ্জের

জেলে থাকার সময়টায় সেসময়ের সরকার অনেক ধরনের ভয়ভীতি, লোভ, দল পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন বলেছি, যার পায়ের নিচে থেকেছি, সেখানে আছি মনে করেই মরতে চাই। এখন কোনো পদ, লোভ ও ভয়ভীতি দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর পায়ের নিচ থেকে আমাকে সরাতে পারবেন না

চার নম্বর সংসদীয় আসনে (সদর আসন) আমি সব সময় মনোনয়ন পেয়েছি। অন্য আসনে একেকবার একেকজন পেয়েছেন। জিয়াউর রহমানের শাসনামলেও আমিই সংসদ সদস্য হয়েছি। এরশাদের সময়ও হয়েছি।

১৯৮১ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই। ১৯৯১ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছা অনুযায়ী মুন্সীগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিই। তা যথাযথ পালন করার চেষ্টা করেছি। শোক, তাপ ও কষ্টের ভার নিয়েই রাজনীতি করেছি।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি বলবেন?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি একটা থানা, সেখানে মুসলিম লীগ আমলে একটা লোক ছিল, জবরদস্ত লোক মুজিবর রহমান। মুন্সীগঞ্জের আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা মিলে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে বলেছেন, মুন্সীগঞ্জ সদরে মহিউদ্দিনের জন্য আমরা কেউ টিকতে পারছি না। অভিযোগ করছে, তারা কিছুতেই পেরে উঠছে না আমার সঙ্গে। সব শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'মহিউদ্দিন তো আমার সঙ্গেই থাকে সারাক্ষণ, ওখানে যায় না, যাওয়ার সুযোগ পায় না। তারপরও ওর বিরুদ্ধে এতগুলো কথা বলছেন। এতজন মিলে ওর একার সঙ্গে পারছেন না, তাহলে তো মহিউদ্দিনই আমার ভালো।' শুনে ওনারা চুপ করে গেলেন। অভিযোগের উত্তর কীভাবে তিনি দিলেন, কী জ্ঞানের, কী মনের পরিচয় লিডারের ব্যক্তিত্বে! বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে এমন জবাব আসবে? আমি তো আর সেখানে ছিলাম না, শুনিনি, শুনেছেন শেখ শহীদ। বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা, তিনি ছিলেন সেখানে। আমাকে পরে তিনি বলেছেন, আপনার বিরুদ্ধে তো সব নেতা অভিযোগ করে গেলেন। আমি বললাম, এখন কি আমি গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে চলে যাব? শেখ শহীদ তখন বলেন, 'না, বঙ্গবন্ধু তো জবাব দিয়েছেন–'সবগুলো মিলে যখন মহিউদ্দিনের সঙ্গে পারেন না তাহলে মহিউদ্দিনই আমার ভালো।' একজন কর্মীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীর আর কোনো নেতার কাছ থেকে এমন জবাব, এমন সিদ্ধান্ত, আশা করা যায়? ইচ্ছা না থাকলেও এত নেতা অভিযোগ করতে এসেছে, তাদের মন খুশি করার জন্য হলেও তো তিনি বলতে পারতেন যে, 'এই মহিউদ্দিন, এসব কী শুনছি'; কিন্তু তিনি তা করেননি। এই হচ্ছে আমার বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিলাম আমি মহিউদ্দিন এমনই।

বঙ্গবন্ধু আমাকে কতটা ভালোবাসতেন, তা কয়েকটি বাক্য দিয়ে বোঝানো যাবে না। আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধু দুধের সর খুব পছন্দ করতেন। বঙ্গমাতা সেজন্য গাভি পালন করতেন, বাড়িতে দুধের সর তৈরি করতেন। একদিন সবাইকে নিয়ে খেতে বসেছেন বঙ্গবন্ধু, আমি পরে খেতে বসতাম। তিনি খেতে বসলে পাহারা দিতাম, কেউ আসছে কি না, টেলিফোন ধরার কাজ থাকত। সেদিন খাওয়া শেষে দুধের সর খেয়ে খানিকটা প্লেটে রেখে দিলেন। টেবিলে রাসেল, কামালও খেতে বসেছে। তিনি ওঠার সময় বঙ্গমাতাকে ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে বললেন, বাকি সরটা যেন আমাকে দেন, আমি যেন খাই। কামাল, রাসেল বা অন্য কাউকে নয়, আমাকে খেতে দিলেন। আমার প্রতি কত যে খেয়াল, যত্ন আর ভালোবাসা ছিল লিডারের।

আরেকটি ঘটনা–পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে তিনি তখন সবে লন্ডনে এসেছেন। ফোন করে দেশের পরিস্থিতির খবর নিয়েছেন, বঙ্গমাতার সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই পরিস্থিতিতে তিনি এত কিছুর পরও আমার মতো ধূলিকণাসম মানুষের খবর জানতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু, 'মহিউদ্দিন কেমন আছে?' এ জীবন তো ধন্য আমার।

১৬ ডিসেম্বরের পর পরই জিপিও ভেঙে ফেলার খবর পেয়ে আমি সেটা রক্ষার জন্য গিয়েছি। পথে প্রয়াত মেয়র হানিফ আমাকে ডেকে বলছেন, মহিউদ্দিন, নেতা লন্ডন থেকে ফোনে তোর কথা জানতে চেয়েছেন; দ্যাখ তুই কত ভাগ্যবান।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার কয়েকটা ছবি আছে, যা অন্যরকম ইতিহাস। এর পেছনের গল্পটা...?

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: হ্যাঁ, ৭ মার্চের ছবিটা, পেছনে যে হাততালি দিয়েছিলাম? প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, নেতার সঙ্গে মঞ্চে উঠে পেছনে দাঁড়িয়েছি। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলাম। সে কী দৃশ্য। মানুষ আর মানুষ। সেদিন আমি না দাঁড়ালে অন্য কেউ দাঁড়াতে পারত। কিন্তু আমিই দাঁড়ালাম। ভাষণ শুরু করেন। ময়দানে জনতা উত্তেজিত। একপর্যায়ে আমি হাততালি দিতে শুরু করি। কী যে হলো সেদিন। কতবার যে হাততালি দিয়েছি। ভাষণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলাম। কতবার কতজন যে ছবি তুলেছে। তখন তো আর ভাবিনি যে ৭ মার্চের ভাষণ এত মূল্যায়ন হবে। ইতিহাস হয়ে যাবে। এতসব হবে জানলে আরও বেশি পোজ দিতাম, হাহা। বিভিন্ন মোশনে ছিলাম তবে হাততালির সময়টার ছবি আছে, ভিডিয়ো হয়ে আছে। এটা

নিয়ে আরেকটা মজার কথা বলি, একবার কোনো এক সাংবাদিক ড. কামাল হোসেনকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি যে ৭ মার্চে ভাষণে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছেন, শুনে ড. কামাল হোসেন বলেছেন, 'এটা তো আমি নই, সে তো মুন্সীগঞ্জের মহিউদ্দিন।' অনেকেই ভেবেছে যে সেই ছবিতে ড. কামাল হোসেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে সেদিন আমি ছিলাম।

আমার কোলে বঙ্গবন্ধুর ছবির গল্পটা খুলনার সুন্দরবনের। স্বাধীনতার পরের সময়টা, দেশে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি স্বচক্ষে দেখার জন্য বঙ্গবন্ধু সুন্দরবনে গেছেন সদলবলে। আমিও সঙ্গে আছি। সবাইকে নিয়ে 'সুরাইয়া' নামের স্টিমারটি সুন্দরবনের হীরণ পয়েন্টে থেমেছে। সকালবেলা, জোয়ারের সময় পানিভর্তি ছিল পাড় পর্যন্ত। সবাই সহজে সিঁড়ি বেয়ে নামতে পেরেছে। ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন বঙ্গবন্ধু, দুপুর পার হয়েছে। বিকাল হয়ে আসছে। তখন ভাটার টানে পানি নদীর পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে। সেখানে কাদা আর পানিতে খারাপ অবস্থা হয়ে আছে। স্টিমারে উঠতে গেলে সিঁড়িতে ওঠার জন্যও এই কাদামাখা জায়গাটা পার হতে হবে। বঙ্গবন্ধু পাড়ে এসে পথটা অবলোকন করলেন, অবস্থা দেখে ইতস্তত করছেন। আমি তো পাশেই দাঁড়ানো। কিছুক্ষণ পর বলছেন, 'ওই, মহিউদ্দিনরে, বাবা আমি তো এই কাদা দিয়া হেঁটে স্টিমারে যাইতে পারমু না।' বলি–কী করমু স্যার আমি। একটু ভেবে নিয়ে জোরে বলে ফেললেন, 'অই, তুই আমারে কোলে কইরা দিয়া আয়।' ঠিক আছে বলে আমিও হাত পাতলাম, আমার ঘাড়ে ধরে কোলে উঠলেন, স্টিমারে নিয়ে উঠিয়ে দিলাম বঙ্গবন্ধুকে; এই হলো ইতিহাস। তখন সেখানে ছিল আলম ফটোগ্রাফার, সে যে এত দুষ্টু, তা তো জানি না। কখন যে ছবি তুলেছে খেয়াল করিনি। মাসতিনেক পরে আলম বলে, দোস্ত বঙ্গবন্ধুকে কোলে নেওয়ার ছবিটা রাখো। আমিও অ্যালবামে রেখে দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু এই ছবি দেখেছেন কি না মনে নেই।

আরেকবার খুলনার মোংলা বন্দরে গেছেন বঙ্গবন্ধু। বন্দরে জাহাজ ভিড়তেই অসংখ্য মানুষ বঙ্গবন্ধুর নামে স্লোগান দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুও এগিয়ে এসে হাত নাড়ছেন, দেখছি তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছেন, এর নিচেই সমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। যদি পড়ে যান কোনো কারণে; তাই অতকিছু না ভেবেই পেছন থেকে শক্ত করে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরি, যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে না যান। এই হলো জড়িয়ে থাকার ছবির পেছনের গল্প।

এসব গল্প বলতে গেলে নিজেকে সামলাতে পারি না। ভেঙে টুকরো হয়ে যাই। কেবলই মনে হয় আমি কেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারলাম না!

বনশ্রী ডলি: আরো অনেক গল্প বাকি আছে, তবুও সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন: হ্যাঁ, তবুও অনেক কথা বলেছি আপনাকে। কারণ, আপনি না বলিয়ে ছাড়ছেন না। মনে পড়লে আরেক দিন বলব। আবার আসবেন। আপনাকেও ধন্যবাদ।

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক

আলী হাবিব

মহাকাব্যের মতো জীবন তাঁর। প্রতিটি পরতে জড়িয়ে আছে রোমাঞ্চ। ছাত্রনেতা থেকে যুবনেতা, যুবনেতা থেকে নেতৃত্বের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন; কিন্তু মাটির সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সংযোগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পীদের অতি আপনজন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডে দেখা যাবে, সাংবাদিকদের তথ্য দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। তাঁর বাড়িতে সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের অবাধ যাতায়াত ছিল। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতায় কোনো কমতি ছিল না। ফয়েজ আহমদ, এবিএম মূসা ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে তিনি আপদ, বিপদ ও মুসিবত নামে ডাকতেন–এ গল্প সাংবাদিক সবারই জানা। ফয়েজ আহমদ ছিলেন আপদ, এবিএম মূসা বিপদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মুসিবত। সেই সময়ের সাংবাদিকদের কাছে তিনি ছিলেন মুজিব ভাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সাংবাদিকবান্ধব রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, জীবনের কোনো একটা সময়ে তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন। আমরা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখায় পাই, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সাংবাদিকতাও করেছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ 'সাপ্তাহিক মিল্লাত' নামে একটি কাগজ বের করে। এই কাগজের প্রধান সম্পাদক ছিলেন আবুল হাশেম এবং সম্পাদক ছিলেন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস।

বঙ্গবন্ধু তখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ) পড়েন এবং বেকার হোস্টেলে থাকেন।

নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের যে অংশ তখন হাশেম-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতিশীল অংশের সমর্থক, বঙ্গবন্ধু সেই গ্রুপের একজন নেতা ছিলেন। তিনি মিল্লাত পত্রিকার

সঙ্গে যুক্ত হন। এমনকি এই পত্রিকা বিক্রির জন্য ছোটো একটি ছাত্র গ্রুপ নিয়ে হাওড়া ও শেয়ালদা স্টেশনে যেতেন। কখনো সোহরাওয়ার্দী বা আবুল হাশেমের সঙ্গে মফস্বল সফরে গেলে মিল্লাত পত্রিকা সঙ্গে নিতেন প্রচার বৃদ্ধির জন্য।

দৈনিক আজাদ তখন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নাজিমউদ্দীন গ্রুপের সমর্থক। আবুল হাশেম ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে আজাদ কৌশলে প্রচার চালাত। বঙ্গবন্ধু ছদ্মনামে এই প্রচারণার কোনো কোনোটির জবাব লিখতেন ছোট ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে।

তাঁর এই সাংবাদিকতার কথা আমি বহু পরে জানতে পারি কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের মুখে, যখন তিনি ঢাকায় অবজারভার গ্রুপের বাংলা সাপ্তাহিক পল্লীবার্তার সম্পাদক–সময়টা ১৯৬৬ কী '৬৭ সাল। ইদরিস ভাই শেখ মুজিব কী ছদ্মনামে মিল্লাতে অনিয়মিতভাবে লিখতেন, সেই নামটাও বলেছিলেন। নামটা ছিল মৌখিক।" (সূত্র: তৃতীয় মত, সাংবাদিক শেখ মুজিব, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, যুগান্তর, ১৬ মার্চ ২০২০)।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আরও লিখছেন, "১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, তখন হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের উদ্যোগে দৈনিক ইত্তেহাদ বের হয় কলকাতা থেকে।

১৯৯ পার্ক স্ট্রিটে ছিল ইত্তেহাদ অফিস। আবুল মনসুর আহমদ হন সম্পাদক। পত্রিকাটি তরুণ প্রজন্মের বাঙালি মুসলমান পাঠকদের মধ্যে বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টি ছিল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের দিকে। তিনি তাদের সাংবাদিকতার দিকে টানতে চেয়েছেন। তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (পরবর্তীকালে ঢাকায় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) দিকে।

মানিক মিয়া চাকরি নিয়েছিলেন ইত্তেহাদের ব্যবস্থাপনা বিভাগে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইত্তেহাদে দু-চার কলম লিখতেন। তিনি তাঁকে সাংবাদিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। শেখ মুজিবকেও উৎসাহ দিয়েছিলেন।

কিন্তু শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, মনসুর ভাই, মিল্লাতের মতো ইত্তেহাদেও আমি লিখব। কিন্তু সাংবাদিক হব না। সাংবাদিকতা আমার নেশা। কিন্তু পেশা রাজনীতি। আমি রাজনীতিক হব।

বঙ্গবন্ধুর মতো মানিক মিয়াও ছিলেন মুসলিম লীগের হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সমর্থক। একই রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী।

সম্ভবত কলকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর থিয়েটার রোডের বাসা অথবা ইত্তেহাদের পার্ক স্ট্রিটের অফিসে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়ার পরিচয়, এই পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। স্থাপিত হয় বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়াকে ডাকতেন মানিক ভাই। মানিক মিয়া তাঁকে ডাকতেন মুজিবর মিয়া।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুজিব-মানিক মিয়া জুটির অভ্যুদয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। একজন রাজনৈতিক নেতা, অপরজন সাংবাদিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই দুটি নাম ইতিহাসে সমানভাবে উচ্চারিত হবে। মানিক মিয়াকে বঙ্গবন্ধু কতটা সম্মান করতেন তার প্রমাণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার সবচেয়ে বড় রাস্তাটির নামকরণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ করা।" (সূত্র: তৃতীয় মত, সাংবাদিক শেখ মুজিব, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, যুগান্তর, ১৬ মার্চ ২০২০)।

সাংবাদিকদের কাছে পেলে মনের অর্গল খুলে বসতেন বঙ্গবন্ধু। সাংবাদিকরা যেমন তাঁর কাছে যেতেন, তিনিও সাংবাদিকদের সাহচর্য পছন্দ করতেন। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশে সেই তাঁর প্রথম জাতীয় প্রেস ক্লাবে আসা। সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন তিনি। সেই স্মৃতি তুলে ধরেছেন সিনিয়র সাংবাদিক হারুন হাবীব। তিনি লিখেছেন, "ভাষণটি শুরু করেন বঙ্গবন্ধু এভাবে: 'আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না; তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধুও ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।' তিনি বলেন: 'সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশ কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজে কখনো কোনো রকম হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও নূতন বাংলাদেশ, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ।'

দেশ স্বাধীনের মাত্র কয়েক মাসের মাথায় সাংবাদিকতার নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে জাতির পিতা বলেন: 'গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনি একটা নীতিমালা আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সামরিকচক্রের হীন কাজে সহায়তা করেছেন।...এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোনো দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি আলবদরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন।

এমন সাংবাদিকও আছেন, যাঁদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তাঁরা হানাদার বাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাঁদের গায়ে হাত দিলে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত করা হবে?'

প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে জাতির পিতা সেদিন আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন: যিনি একদিন দৈনিক 'পয়গাম' চালাতেন, তিনি যদি আয়-উপার্জনহীন কোনো ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি একখানা দৈনিক কাগজ বের করেন, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এই মালিকের টাকা কোত্থেকে এলো? এরপর আবার এই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মালিক-সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখতে আরম্ভ করলেন।...বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এ দেশে আর কখনো ছিল না। এই জন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপানো হয়, 'এক লক্ষ বামপন্থি হত্যা', 'বিমান বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ' ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপানো হয়?" (তথ্যসূত্র: বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা-উত্তর সাংবাদিকতা, হারুন হাবীব, সমকাল, ১৭ মার্চ ২০২৩)।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোখানে কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারা জীবন জনগণের সাথে নিয়ে সংগ্রাম করেছি, এখনো করছি, ভবিষ্যতে যা কিছু করব জনগণকে নিয়েই করব

১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। উদ্‌বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "দেশের জনগণের চিন্তা ভাবনা, আনন্দ-বেদনা এবং সামগ্রিক অর্থে তাদের জীবনপ্রবাহ আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে অবশ্যই ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্যে ও শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে এদেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা, সাজানো হবে তাদের কল্যাণ। আজ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ তুলে ধরুন। দুর্নীতির মূলোৎপাটনে সরকারকে সাহায্য করুন। আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোখানে কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারা জীবন জনগণের সাথে নিয়ে সংগ্রাম করেছি, এখনো করছি, ভবিষ্যতে যা কিছু করব জনগণকে নিয়েই করব। সুধী বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার আবেদন–আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ হয়ে না থকে। বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও তাতে প্রতিফলিত হয়। আজকের সাহিত্য সম্মেলনে যদি এসবের সঠিক মূল্যায়ন হয়, তবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব।" (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। বাংলা একাডেমিতে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ)

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশের পথিকৃৎ সাংবাদিক তোয়াব খান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি। বঙ্গবন্ধুই ডেকে নিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁর স্মৃতিতেও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু। তিনি লিখছেন, "প্রধানমন্ত্রীর ওখানে আমি যোগ দিয়েছি ১৯৭৩ সালের মে মাসে।...আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখো, এখন নির্বাচন প্রচারে ব্যস্ত আছি। যদি নির্বাচনে জিততে পারি তাহলে আমি প্রধানমন্ত্রী হবো। যদি মেজরিটি না পাই তাহলে আমি জাতির পিতা হিসেবে থাকব। তখন তুমি তোমার মতো কাজ করো। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। আমার কিছু কাজ আছে, সেগুলো তোমাকে করে দিতে হবে।'

...ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনেক বিষয় আছে। আমরা তো সরকারি চাকরিতে বহিরাগত। বহিরাগত সাংবাদিক।...তিনি অনুভব করতেন, আমরা যারা বাইরে থেকে আসছি, যে ইনফরমেশনগুলো পাই, জনগণের যে প্রতিফলন সেটা আমরা যেন সংগ্রহ করতে পারি। যে কারণে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্কটা ভালো হয়ে ওঠে।...শেখ মুজিবুর রহমান শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি যেহেতু জাতির পিতা এবং ওইভাবে সরাসরি ব্যবহারটা করতেন। কিছুক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে দেরি হয়েছে। তিনি খোঁজ করেছেন, পাননি। আমাকে বললেন, কী খবর, বলো। ব্যক্তিগত কী দরকার। কারও যদি চিকিৎসার দরকার হয় ইমিডিয়েটলি ডাক্তারকে ফোন করো। মানে ব্যক্তিপর্যায়ে তিনি খোঁজখবর নিতেন।" (যখনই ছায়াটা সরে যায়, তখনই অভাবটা বোঝা যায়: সাক্ষাৎকার: তোয়াব খান: পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমকাল)

তোয়াব খান আরও লিখেছেন, "প্রথম কাজ ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তৃতা লেখা। বক্তৃতা লেখার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তুমি একা চলে আসবা। এসে কথাবার্তা বলবা।' এই হচ্ছে সূত্রপাত। আমি ১৯৭৩ সালে যখন প্রথম সেখানে যাই, তখন নিতান্তই বহিরাগত ছিলাম। তারপর ক্রমে একেবারে কাছের লোক হিসেবে কাজ করতে পেরেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রনায়ক নয়, এগুলোর চেয়ে ব্যক্তি মুজিব বড়। তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতেন না। যারাই তাঁর সঙ্গে কাজ করত, সবাই তাঁর নিজের লোক। ওভাবেই তিনি দেখতেন।

গণভবনের লেকে মাছ ছাড়া আছে। আমাকে বললেন, 'দেখো, এই মাছগুলো আমি কখন আসব ওরা জানে। আসলে আমি খাবার দেব। তারপরে খেয়ে চলে যাবে।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ স্যার, মাছেরা তো সব বুঝতে পারছে, আপনি আসছেন।'

তিনি বললেন, 'অ্যাই, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস নাকি।' আমি বললাম, 'কোনোদিন হয় এ রকম!' এই কথাগুলো শুধু তাঁকেই বলা যেত।

...ফিরে এসে একটা ক্লিমেন্সি ফরমান জারি করলেন। জেলে ছিল যারা, তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। ক্লিমেন্সির প্রথম যে ড্রাফটা ছিল তাতে সবাই ছাড়া পেয়ে যেত। তখন আমলারা খুব খুশি। এমনকি অনেক আওয়ামী লীগ নেতাও খুশি। একজন বললেন, সবুর ভাইয়ের টেলিফোনটা রেস্টোর করা দরকার। অমুক জায়গায় তাঁর বাড়িটা দখল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু বলছেন, এগুলো করে দেওয়া যাবে। এখানে আমি, গাফ্‌ফার চৌধুরী আর এমআর আখতার মুকুল–আমরা তিনজন ছিলাম। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সবাই দেখো। সবার আজকে খুব আনন্দের দিন। কেবল তিনজনের মুখে কোনো হাসি নেই।'

আমি বললাম, স্যার, হাসিটা কী করে আসবে! আমাদের মা-বোনদের যারা রেপ করেছে, তাদেরও ছেড়ে দিতে হবে। যারা বাড়িঘর জ্বালিয়েছে, তারাও ছাড়া পাবে। যে খুন করেছে, তাকেও ছাড়তে হবে।

সব শুনে বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন, 'তোমরা করো কী? আমাকে তো ডেঞ্জারাস পথে নিয়ে যাচ্ছিলে।' তখন ডেকে আবার সংশোধন করা হলো। এটা বলা সম্ভব হয়েছিল তিনি শেখ মুজিব বলে। তিনি

বঙ্গবন্ধু বলে। তিনি জাতির পিতা বলে।" (তোয়াব খানের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ মহানায়ক থেকে)।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর, পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী ময়দানে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় বাঙালির সর্বোচ্চ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেদিনের সংবর্ধনা সভায় বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেকসপিয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও সে তুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হবেই।'

সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক সম্পর্কের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন ওপার বাংলার সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ মনোজ বসু। চীন দেখে এলাম গ্রন্থে মনোজ বসু লিখেছেন, "সেই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মুজিবুর রহমান এসেছেন আমার ঘরে। এমনি চলত আমাদের, কোনোদিন আমি যেতাম ওদের আস্তানায়, কোনোদিন বা আসতেন ওঁদের কেউ কেউ। খাস বাংলায় অনেক রাত্রি অবধি গল্পগুজব চলত। বক্তৃতার আসরের ওই হাততালির কথা উঠল। কি গো ভায়া, পশ্চিম পাকিস্তানিদের খুব তো নিন্দেমন্দ করেন বাংলা ভাষায় শত্রু বলে। অমন সংবর্ধনা কী জন্যে হলো তবে?

'মুজিবুর বললেন, ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ওরা আমাদের ভয় করে। গুঁতোয় পড়ে বাংলা ভাষার এত খাতির।'...মুজিবুরের সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা, ঢাকায়। ইলেকশনে মুসলিম লীগ গো-হারা হেরেছে, ভাষাসংগ্রামীদের জয়জয়কার–ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় সাংস্কৃতিক উৎসবে দাওয়াত খেয়ে পরমানন্দে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলাম। আওয়ামী লীগের কর্তারা একদিন আমাদের ডাকলেন। একেবারে নদীর ওপর দোতলায় হলঘর, হাসিমুখ মুজিব আমাদের বুকে জড়িয়ে ওপরে নিয়ে গেলেন।" (একাত্তরে বঙ্গবন্ধু বন্দি থাকাকালে সাহিত্যিক মনোজ বসুর লেখা 'মুজিবের কথা', প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০২১)

বঙ্গবন্ধুর অমূল্য স্মৃতিতে যাঁদের ভান্ডার সমৃদ্ধ, তাঁদের একজন রফিকুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত এই এমিরেটাস অধ্যাপক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার বঙ্গবন্ধুর দেখা হয়েছে। স্মৃতিকথায় তিনি সেসব কথা তুলে ধরেছেন। সংকট মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত যে কতটা কার্যকর ছিল, সেটা বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা ১৯৫৭ সালে। রফিকুল ইসলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি থাকেন সংগঠকের ভূমিকায়। বঙ্গবন্ধু তাঁদের নাটকের দল নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই দলটি যখন করাচি অবস্থান করছিল, তখন বঙ্গবন্ধু সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাজ হোটেলে তাঁদের নিয়ে বসেছিলেন। কী বলেছিলেন? রফিকুল ইসলাম লিখছেন, "তিনি আমাদের বললেন, 'দেখ ভাই-বোনেরা শুধু নাচগান করার জন্য তোমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়নি, তোমাদের পাঠানো হয়েছে পূর্ব বাংলার পাট ও চা-এর পয়সায় পশ্চিম পাকিস্তানে কি রকম উন্নতি চলছে, তা দেখার জন্য, চোখ কান খোলা রাখবা; সব বুঝতে চেষ্টা করবা, পূর্ব বাংলা কেন অনুন্নত, পূর্ব বাংলা কেন বঞ্চিত।'...পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য শেখ সাহেব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেই ১৯৫৭ সালে।"

বঙ্গবন্ধু যখন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন একবার ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ কয়েকজন সিনিয়র অধ্যাপককে সিনেট কক্ষে আটক করে রাখে। এই খবর নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যান কয়েকজন শিক্ষক। তিনি কোনো পুলিশ পাহারা ছাড়াই তাঁদের সঙ্গে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। রফিকুল ইসলাম লিখছেন, 'বঙ্গবন্ধু বাঘের মতো গর্জন করে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন এবং এক লাথিতে গেট ভেঙে ফেললেন। আন্দোলনরত ছাত্ররা বঙ্গবন্ধুর ওই রুদ্রমূর্তি দেখে নিমেষে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু একাডেমিক কাউন্সিলের সভাকক্ষে গিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেললেন।'

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা। তিনি সবার, সব মানুষের। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় যেন এক একটি উপন্যাসের সুলিখিত অধ্যায়, যেন এক একটি চলচ্চিত্রের সাজানো চিত্রনাট্য। সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে তাঁর যে হার্দিক সম্পর্ক ছিল, ছোটো পরিসরে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল...। আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব?'

বহুমাত্রিক বঙ্গবন্ধুকে প্রণতি।

লেখক: সাংবাদিক, ছড়াকার

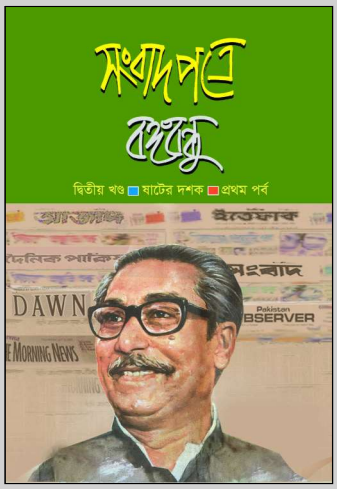

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা

ড. মিল্টন বিশ্বাস

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার–এ কথা বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। শিক্ষা ব্যতীত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়–স্বাধীন দেশের অগ্রগতিসাধনে এ কথাও সবাইকে জানিয়েছিলেন তিনি। জীবনযাপনের মানোন্নয়নে শিক্ষা একমাত্র চালিকাশক্তি, রাষ্ট্রপরিচালনায় এ বিষয়টি তিনি সব সময় মনে রেখেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, 'শিক্ষাই হবে মুক্তির হাতিয়ার।' মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে দেশের প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শিক্ষাকার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং ৯০০টি কলেজ ভবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। রাজাকার-আলবদর-আলশামসরা স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে দেশের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি করে।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে–'জরুরি ভিত্তিতে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণের জন্য ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে শূন্য কোষাগার নিয়েও বঙ্গবন্ধু দেশের সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ, ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ, নতুন ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং কলেজের সব শিক্ষকের এডহক চাকরি নিয়মিত করেছিলেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পোশাক প্রদান, শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে বই, খাতা, পেনসিল, দুধ, ছাতু, বিস্কুট বিতরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য চাল-ডালসহ পূর্ণাঙ্গ রেশনিংব্যবস্থা চালু করেছিলেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন। নারী শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা

করেছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটির ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তির জন্য গুণগত শিক্ষা অপরিহার্য। দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এবং শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির হাতিয়ার হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি আজন্মলালিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য তিনি তাঁর মনোযোগের সিংহভাগ নিয়োজিত করেছিলেন শিক্ষার প্রতি।' (ডা. দীপু মনি, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা সোনার বাংলা গড়ার পথরেখা)

মানবসম্পদ বেশি মূল্যবান ছিল বলেই বঙ্গবন্ধু শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বীরের বেশে দেশে ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধু বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, 'আমার বাংলার মাটি আছে, আমার বাংলার মানুষ আছে। আমি বাংলার মাটি এবং মানুষকেই সোনা বলে মনে করি। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। খনিজসম্পদের চেয়েও বড়ো সম্পদ। এই মানবসম্পদই একদিন বাংলাদেশকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যাবে।' সমাজ ও মানবজীবন বিকাশে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সংকল্পে অটল ছিলেন জাতির পিতা। তিনি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মানুষের মেধা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এজন্য সব নাগরিকের শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে নিবেদিত ছিলেন। সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের বন্দোবস্ত করার জন্য যেসব কাজ করেছিলেন, তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার উৎস

১৯৭২-এর সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোয়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলে এবং কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র ও বিভিন্ন কর্মসূচি এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রকাশ রয়েছে। শিক্ষাভাবনার আলোকেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন।

ভাষণে শিক্ষাচিন্তা

১৯৭২ সালের মার্চে চট্টগ্রামে এবং ১৯৭৩ সালের মার্চে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) দেওয়া ভাষণসহ স্বাধীনতার আগে দেওয়া আরও অনেক ভাষণে শিক্ষাভাবনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্ববহ মতামত পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে বঙ্গবন্ধু একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যার প্রধান কাজ ছিল চলমান শিক্ষাব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা এবং সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে সুপারিশ করা। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য শাসনামলের শুরু থেকেই বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষার দুরবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশা

পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। একটি উদ্ধৃতি স্মরণীয়, পূর্ববাংলার মানুষের ওপর নজিরবিহীন অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন চলছে। শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা সহজে চালাতে পূর্ববাংলাকে শিক্ষায় পিছিয়ে রেখে সংস্কৃতি চেতনায় দুর্বল ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার মধ্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কৌশল ছিল এর প্রথম হাতিয়ার। একটি সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করার আয়োজনও করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পরপর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর তৎকালীন শিক্ষাসচিব ড. এসএম শরীফকে প্রধান করে গঠিত শরীফ কমিশনের রিপোর্ট ছিল এই বঞ্চনাকে স্থায়ী করার প্রথম দলিল। এর কয়েকটি সুপারিশ ছিল শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষা সংকোচনের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রণীত। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রদের অভিযোগ ছিল:

'স্বৈরতান্ত্রিক আইয়ুবশাহী [...] ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করিয়া, তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স চালু করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আসন সংখ্যা কমাইয়া দিয়া, স্কুল-কলেজে বইয়ের বোঝা বৃদ্ধি করিয়া, তুঘলকি সিলেবাস চালু করিয়া, বৎসর বৎসর অর্থব্যয়কারী ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করিয়া আসলে এমন এক শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে অধিকাংশ জনসাধারণের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাগ্রহণের পথই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।'

পূর্ববাংলার সর্বসাধারণকে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আয়োজন করেছিল শরীফ কমিশন। ছাত্ররাজনীতি স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ষড়যন্ত্রও এর সঙ্গে ছিল। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৫৮ থেকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি থাকায় ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন রহিত করার পর শিক্ষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনে মোস্তফা, বাবুল ও ওয়াজি উল্লাহ মারা যান। আন্দোলনের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত শরীফ কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করলেও নানাভাবে এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

পাকিস্তানের সৃষ্টির আগে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে যেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল, সেখানে পাকিস্তানের জন্মের পরের দুই দশকে (১৯৪৭-৬৭) পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব পাকিস্তানে তা কমেছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে শিক্ষা খাতে ব্যয়িত ২০৮৪ মিলিয়ন রুপির মধ্যে মাত্র ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি ব্যয় করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে, যা এক-তৃতীয়াংশের সমান। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বরাদ্দের ২০ শতাংশ ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৮০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে। এই নির্মম বৈষম্যে ক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। (ডা. দীপু মনি, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা সোনার বাংলা গড়ার পথরেখা)

এহেন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ চট্টগ্রামে শিক্ষক ও লেখকদের এক সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় অনুশোচনা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিকশিত মানুষ সৃষ্টির পরিবর্তে এটি শুধু আমলা তৈরি করছে।' তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা যাবে না এবং সম্ভব হবে না সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করা। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে কিছুদিন করে গ্রামাঞ্চলে কাটানোর পরামর্শ দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু আভাস

> আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজে যাতে সত্যিকারের মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানি পয়দা করেই একবার ইংরেজ শেষ করে দিয়ে গেছে দেশটা। তোমাদের মানুষ হতে হবে ভাইরা আমার

দেন, দেশের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। তিনি বলেন, 'পূর্বের সকল শিক্ষা কমিশন বাঙালিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু। সেদিনের অনুষ্ঠানে নতুন স্নাতক সনদধারী ও শিক্ষকদের সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ২০০ বছরের এবং পাকিস্তানের ২৫ বছরে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা শুধু কেরানি তৈরি করেছে, মানুষ তৈরি করেনি।' এজন্য তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন, যার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা যাবে এবং সেটি স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বৈদেশিক নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দেন এবং এটিকে টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসাবে চিহ্নিত করেন। বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন কাজ করছে এবং আশা করেন, এই কমিশন একটা শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ এমন একটি প্রতিবেদন জমা দেবে, যা জাতিকে সমৃদ্ধি ও মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধু এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে মানুষকে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। একটি যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সুষম ও টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল উদ্দেশ্য।

সনদসর্বস্ব শিক্ষা নয়

স্বাবলম্বী জাতি গঠনে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও ব্যাবহারিক শিক্ষা এবং কায়িক শ্রমের মর্যাদা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার অন্যতম দিক ছিল। ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাবারা, একটু লেখাপড়া শিখ। যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ করো, ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখলে কোনো লাভ নেই। আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু থাকে বাপ-মাকে সাহায্য করো। প্যান্ট পরা শিখেছ বলে বাবার সাথে হাল ধরতে লজ্জা করো না। দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখ, কানাডায় দেখলাম ছাত্ররা ছুটির সময় লিফট চালায়। ছুটির সময় দুপয়সা উপার্জন করতে চায়। শুধু বিএ/এমএ পাশ করে লাভ নেই। আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজে যাতে সত্যিকারের মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানি পয়দা করেই একবার ইংরেজ শেষ করে দিয়ে গেছে দেশটা। তোমাদের মানুষ হতে হবে ভাইরা আমার। আমি কিন্তু সোজা সোজা কথা কই, রাগ করতে পারবে না। রাগ করো আর যা করো, আমার কথাগুলো শোন। লেখাপড়া করো আর নিজেরা নকল বন্ধ করো।'

প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষাই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য। তিনি বলেছিলেন, 'ডিগ্রি নিয়ে লাভ হবে না। ডিগ্রি নিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। ডিগ্রি নিয়ে নিজের আত্মাকে ধোঁকা দেওয়া যায়। মানুষ হতে হলে লেখাপড়া করতে হবে। (শিক্ষার মাধ্যমে) মানুষ পয়দা করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ভাবনা শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর চিন্তাধারা কাজে বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার পরিসর ব্যাপ্ত হয়েছিল দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলা নামক ভূখণ্ডের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর খুলনায় এক ছাত্রসভায় শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'শিক্ষাদীক্ষাই হলো মানবসভ্যতার মাপকাঠি, অথচ আমাদের দেশের অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়া কোন মুখে আমরা বিশ্বদরবারে নিজদিগকে সভ্য জাতি বলিয়া গৌরব করিব? আজ দেখিতে পারিতেছেন আমাদের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, শিক্ষকদের বেতন না বাড়াইলে শিক্ষা সমস্যার সমাধান অসম্ভব। শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা দরকার।'

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টোতে শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল, 'রাষ্ট্রের প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা সহজলভ্য করিতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষা বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি বৃত্তির সাহায্যে উচ্চতর শিক্ষায় উৎসাহিত করিতে হইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে।'

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ৯, ১০ ও ১১নং দফায় এর শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় দিয়েছিল। নির্বাচনের আগে রেডিয়ো-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি তাঁর শিক্ষাভাবনা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন, "সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়সি শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

কুদরত-ই-খুদা কমিশন

বঙ্গবন্ধুর দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালায়। শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য স্বাধীনতার পরই (১৯৭২ সালে) কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। এই কমিশন ১৯৭৩ সালের জুনে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন শিরোনামে ৩০৯ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে সর্বাধিক বিস্তৃত কাজ, যেখানে শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, এই কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে "বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি এবং ঘাটতি দূর করা...এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে 'মানসম্পন্ন জীবনমান' অর্জনের জন্য মানবসম্পদকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন।" এতে আরও বলা হয়েছে, এই শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন করা। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত না করে কোনো অর্থবহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যায় না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এতে।

কমিশনের প্রধান পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে যেসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হলো: শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষিত করা, শিক্ষকদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, শিক্ষার সব পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ, ইংরেজি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়নের জন্য ফলিত গবেষণার ওপর জোর দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা, সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষাকে একটি বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা। এই কমিশন আরও সুপারিশ করেছে যে, প্রতিবছর জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা ৭ শতাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাবও দেওয়া হয় এই প্রতিবেদনে।

বঙ্গবন্ধু এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। বাস্তবায়নে উদ্যোগও নেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগস্টে তাকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করায় এগুলো আর বাস্তবায়নের সুযোগ তিনি পাননি। তবে এই কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার আগেই শিক্ষা বিষয়ে নিজের দর্শন বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে তুলে ধরা হয়।

মূলত বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতির আলোকে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল এবং এর সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যুক্ত হয়েছে বাঙালি জীবনের চিরকালের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ। বৈশ্বিক পটভূমির বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ডা. দীপু মনির ভাষায়, 'প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে কমিশনের সদস্যদের বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণে রেখে কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করবেন, যা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কারসাধনে সাহায্য করবে।' (ডা. দীপু মনি, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা সোনার বাংলা গড়ার পথরেখা)

শিক্ষা কমিশনে শিক্ষা

বঙ্গবন্ধু গঠিত কমিশন অসাধারণ নিষ্ঠা, শ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে যে

১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শিক্ষানীতি তৈরি করেছিল, সেখানে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এভাবে লেখা হয়েছে:

১.১. শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। দেশের সকল শ্রেণির জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণাসঞ্চার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। তদুপরি শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় মূলনীতি চতুষ্টয়ের সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় নীতিমালা চতুষ্টয়ের যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যায়:

১.২. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, (ক) জাতীয়তাবাদ, (খ) সমাজতন্ত্র, (গ) গণতন্ত্র, (ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা; ১.৩. মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব; ১.৪. নৈতিক মূল্যবোধ; ১.৫. সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা; ১.৬. প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা; ১.৭. কায়িক শ্রমের মর্যাদা দান; ১.৮. কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সঙ্গে কায়িক শ্রমের সমন্বয়সাধন; ১.৯. নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং ১.১০. সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা।

শাসনকালে গৃহীত পদক্ষেপ

১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস নোটে বলা হয়, উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা ভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। ১৯ ফেব্রুয়ারি অন্য একটি প্রেস নোটের মাধ্যমে জানানো হয়, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পাবে বাজারমূল্যের চেয়ে ৪০ শতাংশ কম দামে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের উদ্যোগে ৩৬ হাজার ১৬৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয় এবং বাড়ানো হয় শিক্ষকদের বেতন। এছাড়া নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নারীদের অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বঙ্গবন্ধু কুসংস্কারশূন্য, অনাচার ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে যে বিজ্ঞানমুখী ও আদর্শবাদী শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন তা ছিল অনন্য। দরিদ্র দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে প্র্যাকটিক্যাল বা প্রয়োগমুখী শিক্ষার কথা বলেছেন বারবার। বিপুল জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির বিশাল দায়িত্ব ছিল শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। এ কারণে বঙ্গবন্ধু আধুনিক সমাজের উপযোগী বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সব সময় সামনে এনেছেন।

বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্যভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমবায়ের ভিত্তিতে ছোটো ছোটো কারখানা-খামার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে তাদের কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা স্তরের কৃষি কারিগরি কোর্স চালু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকার গণমুখী শিক্ষার বিষয়কে শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই থেমে থাকেননি, বরং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে, এর মধ্যে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ। জাতির জন্য একটি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যে কত আবশ্যক, তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

শিক্ষা উন্নয়নের বাহন

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় শিক্ষা কমিশন গঠনের বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ প্রস্তাব সংখ্যা ৯০০ শিক্ষা স্মারকের মাধ্যমে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হয়: ১. যেহেতু স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য নবদিগন্তের দিশারি এক সুমহান বিপ্লব এবং এই বিপ্লবচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে ভিত্তি করে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর এবং এই উপলব্ধির আলোকে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান অংশ তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ও তাদের সুশিক্ষার ওপর দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ নির্ভরশীল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে দ্রুত উন্নয়নের বাহনরূপে গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু বাংলাদেশ এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

সংবিধানে শিক্ষা

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নসংক্রান্ত আলোচনায় শিক্ষা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমাদের সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।' শিক্ষাকে জনগণের জীবনধারণের মৌলিক উপাদান হিসাবে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি একটি সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি সংবিধানের অনুচ্ছেদ (১৭) যুক্ত করেন। একটি উদ্ধৃতি–

১৭. রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২৮(৩) ও অনুচ্ছেদ ৪১ (২)-এ ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে জনগণের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ, অবাধ ও শর্তহীন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা

সংবিধানে উল্লিখিত সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব কৌশল গ্রহণ করেছিলেন তা হলো: অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, প্রয়োজনে শিক্ষালয়গুলোতে দুই শিফটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক। স্কুলসংলগ্ন ল্যাবরেটরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন ওয়ার্কশপে বয়সভেদে বিভিন্ন ব্যক্তিদের নানামুখী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ তৈরি করবে। বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে রেডিয়ো, টেলিভিশন, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার্থীদের কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে প্রসার করে শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা করা হবে।

বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শন এখন আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চায়। এর আগে এসডিজি টার্গেট পূরণ করতে হবে। গুণগত শিক্ষামান নিশ্চিত করা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ বৃদ্ধি ছাড়া কোনো দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তাই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন বাস্তবায়ন করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আলোকিত মানুষ তৈরি ও কল্যাণমুখী সমাজের দিকে ধাবিত হওয়া আবশ্যক।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির উন্নতি করা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়, 'শিক্ষা হচ্ছে বড়ো অস্ত্র, যা যে কোনো দেশকে বদলে দিতে পারে।' তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরের মতো প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন দেশ শুধু মানবসম্পদ সৃষ্টি করে যদি উন্নত দেশ হতে পারে, তাহলে বাংলাদেশও একদিন উন্নত দেশ হবে। আর সেজন্যই তিনি নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সেসব উদ্যোগের কিছু ছিল তাৎক্ষণিক আর কিছু ছিল দীর্ঘমেয়াদি। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের মূল সুরে ছিল সামাজিক মূল্যবোধ সৃজন, ধারণ এবং শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে নীতিনিষ্ঠতা ও সততার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি ধর্মান্ধতার পরিবর্তে মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং উদ্ভাবনী চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষার গুণগতমান উন্নত হলে মানবসম্পদ দক্ষ হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তথ্যসূত্র

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।
২. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৭৩-৭৮ (প্ল্যানিং কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৩)।
৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে ১৯৭৪।
৪. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১২।
৫. ডা. দীপু মনি, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা সোনার বাংলা গড়ার পথরেখা।
৬. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-দর্শন ও বাস্তবতা।
৭. শেখ মুজিবুর রহমান, ভাষণসমগ্র (১৯৫৫-১৯৭৫), ভূমিকা : শেখ হাসিনা, এ কে আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা ২০২০।
৮. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা ও তার বাস্তবায়ন', ২০১৯।
৯. ড. হারুন-অর-রশিদ, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮।
১০. মুনতাসীর মামুন, বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা।
১২. ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন।

লেখক: অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; বঙ্গবন্ধু গবেষক

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে!

পাভেল রহমান

মধ্যরাতে আমরা পৌঁছেছিলাম টুঙ্গিপাড়ায়। টুঙ্গিপাড়ার রাস্তায় তখন এক হাঁটু কাদা। আমাদের গাড়িগুলো যখন কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে, তখন কি গাড়িতে আরাম করে বসা যায়। হাসিনা আপা বাদে আমরা সবাই সেই রাতে হাঁটুসমান কাদায় আটকে পড়া গাড়ি ঠেলতে ব্যস্ত। গাড়ি ঠেলে যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর ছোট্ট দুই রুমের দোতলা বাড়িটার সামনে এলাম, তখন মধ্যরাত। গাড়ি থেকে নামতেই চোখ আটকে গেল ডান পাশে গ্রিলে ঘেরা টিউব আলোয় শ্বেতপাথরে বাঁধাই বঙ্গবন্ধুর সমাধি। সেই রাতে ফ্রেশ হয়ে দোতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি কখন যেন এরই ফাঁকে বাবার সমাধিতে নীরবে দাঁড়িয়ে কন্যা–হাসিনা আপা। রাত-বিরাতে ফ্ল্যাশের আলোয় বেশকিছু ছবি তুললেও ছবিগুলো আমার পছন্দ হয় না। না, তখন তো আর ছবি ইনস্ট্যান্ট দেখা যায় না। তারপরও মনের ভেতর গুনগুন করে। ভালোলাগা ব্যাপারটা কাজ করে। ভোরে আকাশের আলোয় ছবি তুলব কাল।

ভোরে ফজরের আজানে ঘুম ভেঙে যায়। দোতলার ঘর লাগোয়া খোলা ছাদে আড়মোড়া ভাঙতেই ঘুম ঘুম চোখে চমকে উঠি, একি! আপা বসে আছেন শান বাঁধানো কবরের পাশে। তাকে দেখে আমি চমকে উঠি। আপা যেন বসে আছেন সেই সুদীর্ঘকাল থেকে 'পাষাণ প্রতিমার মতো'। ততক্ষণে আলো ফুটেছে পূর্ব আকাশে। ক্যামেরাটা নিয়ে দোতলা থেকে যেমন ছিলাম, তেমনই দৌড়ে নামি নিচে। খালি পায়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধির কাছে আসতেই চেনা হাসিনা আপা আর এই হাসিনা আপার মাঝে যেন যোজন যোজন তফাত। মুহূর্তে মনে হয় রক্তমাংসের মানুষ নন তিনি।

আমার যে কি হলো, মায়ায় আমার চোখ ভিজল, চোখের জল মাটিতে গড়াল। দুচোখ ভরে কান্না আসে। বাবার জন্য জন্ম-জন্মান্তরের ভালোবাসায় আমি কেমন অধীর হলাম।

আমার শঙ্কা ছিল, এমন ছবি বুঝি মিস করলাম। এত দীর্ঘ জার্নি করে আমরা যতটা ক্লান্ত, তিনি আমাদের চেয়েও বেশি ক্লান্ত ছিলেন। পথে পথে পথসভায় পিতা হত্যার, মা হত্যার, ভাই হত্যার বিচার চাইলেন, প্রতিশোধের দাবিতে কান্নায় কান্নায় ক্লান্ত হলেন। আমি ভেবেছিলাম

এমনভাবে বাবার কবরের পাশে বসে থাকার অন্তত একটি ছবি যেন তুলতে পারি। ব্যাপারটি তো এমন নয় ক্যামেরায় একটা সার্টার করলাম আর রুমে গিয়ে ঘুম দিলাম।

ছবিতে 'সাবজেক্ট আর অবজেক্টের' সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধনটা যে খুব জরুরি। সেই বন্ধনই তো সৃষ্টি করবে ছবি আর দর্শকের সখ্য। যে যোগসূত্র তৈরি করেছেন তিনি জান্নাতবাসী পিতার সঙ্গে পরম এই আত্মার!

আমি ক্যামেরায় বঙ্গবন্ধুর পবিত্র কবরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতে থাকি। একটা-দুইটা–৩৬টা ছবি। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার, হাসিনা আপা যেমন ছিলেন, তেমনই বসে রয়েছেন। আমি সতর্ক ছিলাম আমার জন্য তাঁর যেন কোনো ধ্যান ভঙ্গ না হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই বিকেল কিংবা গোধূলির সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো।

আবাহনীর ট্রিপল ক্রাউন বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের হাতে!

আমরা ৪ জন একটু তাড়াহুড়া করেই মোহাম্মদপুর থেকে ছুটে এলাম গণভবন। আবাহনী ক্রীড়া চক্র এবার তাদের তিনটি শাখা–ফুটবল, ক্রিকেট আর টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় 'ট্রিপল ক্রাউন' ট্রফি লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ভিন্নধর্মী আরেক যুদ্ধে মনোনিবেশ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে খেলাধুলা, সংগীত এবং নাট্য অভিনয় প্রিয় শেখ কামাল মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বপ্ন বাস্তবায়নে মনোযোগী হয়ে উঠেন। নবীন দেশে ক্রীড়া, নাট্য ও সংগীত আন্দোলন গড়ে তুলতে সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একঝাঁক নতুন প্রজন্মের তরুণ যুবকদের নিয়ে আবাহনী ক্রীড়া চক্র, নাট্যচক্র এবং স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী। যাত্রার শুরুতেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে অপূর্ব নান্দনিক ক্রীড়াশৈলীর মাধ্যমে লাখো দর্শকের হৃদয় জয় করে প্রথম বছরেই বিজয় ছিনিয়ে আনে আবাহনী। আবাহনী তিনটি শাখাতেই সেরা কৃতিত্ব দেখিয়ে চ্যাম্পিয়নের 'ট্রিপল ক্রাউন' মুকুট অধিকার করে!

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবাহনী ক্রীড়া চক্রের 'চিফ পেট্রন', ট্রিপল ক্রাউন লাভে তিনিও উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। আবাহনীর সেক্রেটারি হারুন-উর-রশিদ, বাদল ভাই, বরকত ভাই আর আমি ততক্ষণে পৌঁছে গেছি গণভবনে।

দিনটি ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ ১৯৭৫ সাল। গণভবনে নিরাপত্তার ডিউটিরত ফারুক আহমেদ বাচ্চু ভাই, যিনি নিজেও আবাহনী ক্রীড়া চক্রের একজন অফিসিয়াল, জানালেন রাষ্ট্রপতি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কেএম শফিউল্লাহ এবং ডেপুটি সেনাপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতে রয়েছেন। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ডেপুটি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন।

গণভবনে আমাদের আসার খবরে বঙ্গবন্ধু সেনাপ্রধান আর ডেপুটির সাক্ষাতের মাঝেও ডেকে পাঠালেন আমাদের। তিনি আবাহনীর ট্রিপল ক্রাউন খবরে উৎফুল্ল চিত্তে আমাদেরই অপেক্ষারত ছিলেন। আমরা অফিস কক্ষে ঢুকেই দেখতে পাই রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সাদা সোফায় বসে এবং তার ডান পার্শ্বে বড় সোফায় ডেপুটি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। সেই সোফার অপর প্রান্তে সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ। কিন্তু আমার ছবি তোলার মুহূর্তে বরকত ভাই বঙ্গবন্ধুর সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন যে ফ্রেমের পেছন অংশে বসা সেনাপ্রধান ঢাকা পড়ে যান।

আবাহনীর সদ্য তৈরি লোগো দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন আর প্রশংসা করলেন বঙ্গবন্ধু। সদ্যস্বাধীন দেশে অপ্রতুল খেলাধুলার সামগ্রীর কথা জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অপ্রতুল খেলার সরঞ্জামের মাঝে আবাহনী ক্রীড়া চক্রের মতো নতুন একটি ফুটবল টিম দর্শকদের মাঝে ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এর প্রশংসা করতে ভুললেন না। আমি আমার ক্যামেরায় ছবি তুলছি আর বঙ্গবন্ধুর কথা শোনার চেষ্টা করছি। সেই রাতে গণভবনে এডিসির দায়িত্ব পালন করছিলেন নৌবাহিনীর এডিসি রব্বানি ভাই। বঙ্গবন্ধুর চিফ সিকিউরিটি কর্নেল জামিল সাহেব সেই সময় উপস্থিত ছিলেন।

আমি ছবি তোলার সময় আরও একজনের ছবি তুলেছি বঙ্গবন্ধুর পাশে, তিনি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। মেজর জেনারেল জিয়া সেই রাতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। আমরা পৌঁছানোর আগেই তিনি বঙ্গবন্ধুর হাতে ফুল তুলে তাঁকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানান। জেনারেল জিয়াকে আমি সেই মুহূর্তে চিনতে পারিনি। কিন্তু এই ছবিতেই আমি তাঁকে কালো চশমাবিহীন অবস্থায় পেয়েছি এবং আমি তাঁর ছবি তুলতে পেরেছিলাম কালো চশমা ছাড়াই।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাদের সেই রাতে আবাহনীকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা–সবই নীরবে শুনছিলেন জেনারেল জিয়া। শুনছিলেন উপস্থিত অন্য যারা সেই রুমে উপস্থিত ছিলেন।

হারুন ভাই বঙ্গবন্ধুকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আবাহনীর এই ট্রিপল ক্রাউন অর্জনের পেছনে বড়ো অবদান রেখে চলেছেন আমাদের প্রিয় শেখ কামাল।

আমার জানা মতে, শেখ কামাল ভাই আবাহনীর জন্য কোনো সহযোগিতাই নেননি বঙ্গবন্ধু সরকারের কাছ থেকে। এমনকি সেই সময় 'রেসিডেন্স' খেলোয়াড়দের খাবার বাবদ তিন বেলার ক্লাবের বাজার খরচ কিংবা প্র্যাকটিসের খরচ চালানো ছিল কঠিন। এমনকি কামাল ভাইয়ের পছন্দের আবাহনীর আকাশি নীল জার্সির জন্য প্রায়ই মনে বেদনার সৃষ্টি হতো। সেসময় অনেকের মাঝে বেক্সিমকোর সালমান এফ রহমানের অবদান ছিল নানাবিধ।

আমরা গণভবন থেকে বেরিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের হাতে 'ট্রিপল ক্রাউন' তুলে দিয়েছিলাম।

পাঁচ টাকার রিফিলে তোলা অবিস্মরণীয় সেই ছিবিটি!

বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলব বলে রাতে ঠিকমতো ঘুম হলো না। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। আমি তখন ষোলোতে পড়েছি। পারিবারিক ফটোগ্রাফার থেকে সদ্য স্ট্রিট ফটোগ্রাফারের পর প্রেস ফটোগ্রাফিতে পা রেখেছি। বাবার শখের জাপানিজ মিনোলটা টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা আমার ছবি তোলার একমাত্র সম্বল। এরই মধ্যে ছবি তোলাটা আমার নেশা হয়ে উঠেছে। মা ভীষণ বিরক্ত, 'ছেলে আমার উচ্ছন্নে গেল, সারা দিন ক্যামেরা নিয়ে মাতামাতি।' বলবেন নাই বা কেন? স্কুল থেকেই তো ছুটছি ক্যামেরা হাতে!

এরই মাঝে জড়িয়েছি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'জয়ধ্বনিতে'। 'দৈনিক বাংলা' সাহিত্য পাতায় আর মহিলা পাতায় আমার ছবি ছাপা হচ্ছে পাভেল নামে। আমি তখনও পাভেল রহমান হয়ে উঠিনি। আজ আমার অ্যাসাইনমেন্ট 'বঙ্গবন্ধু'। ছবি তুলব 'জয়ধ্বনির' জন্য। সেই সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আমাকে বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার সুযোগ করে দিলেন। সহযোগিতার হাত বাড়ালেন 'জয়ধ্বনির' সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত আর শহর প্রেসিডেন্ট কামরুল আহসান খান।

আমি সেই সকালে ছুটলাম সোজা নিউমার্কেটে, মোল্লার ছোট্ট টং দোকানে। এফডিসি থেকে আনা কাট ফিল্মের ২টা সাদাকালো ফিল্ম কিনে ফেললাম ১০ টাকায়। ওই ফিল্মগুলো সব সময় খুবই রিস্কি।

ভোরে ফজরের আজানে ঘুম ভেঙে যায়। দোতলার ঘর লাগোয়া খোলা ছাদে আড়মোড়া ভাঙতেই ঘুম ঘুম চোখে চমকে উঠি, একি! আপা বসে আছেন শান বাঁধানো কবরের পাশে। তাকে দেখে আমি চমকে উঠি। আপা যেন বসে আছেন সেই সুদীর্ঘকাল থেকে 'পাষাণ প্রতিমার মতো'। ততক্ষণে আলো ফুটেছে পূর্ব আকাশে। ক্যামেরাটা নিয়ে দোতলা থেকে যেমন ছিলাম, তেমনই দৌড়ে নামি নিচে। খালি পায়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধির কাছে আসতেই চেনা হাসিনা আপা আর এই হাসিনা আপার মাঝে যেন যোজন যোজন তফাত

ক্যাসেটে লোড করার সময় প্রায়ই ফিল্মগুলোয় আঙুলের ছাপ পড়ে। কখনো আবার আলো পাস করে ফিল্মজুড়ে। কিন্তু ওই ৫ টাকার ফিল্ম কেনাও তো ঝক্কি। ফুজি, কোডাক, ইলফরড পাওয়া যায়; কিন্তু ৩৫ মিলিমিটারের দাম ৩৫ টাকা ১টি ফিল্ম। পাঁচ টাকাই যেখানে হাতে পাওয়া মুশকিল, সেখানে ৩৫ তো অনেক টাকা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলব ওই লাইট আর আঙুলের ছাপ লাগানো ফিল্মে? মন না মানলেও যে পকেটে কুলোয় না! অগত্যা কী আর করা, দুইটা কিনে ছুটলাম।

আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের। তারপরও কিশোর জীবনে এই প্রথম আমি ছবি তুলতে দাঁড়িয়েছি দেশের বিখ্যাত সব প্রেস ফটোগ্রাফারের সঙ্গে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি তুলব বলে। সেদিন সেখানে ছবি তুলতে এসেছিলেন আলোকচিত্রী রশীদ তালুকদার, গোলাম মওলা, মোহাম্মদ আলম, জহিরুল হক আরও নাম না জানা অনেকে!

সকাল ১০টার দিকে বঙ্গবন্ধু এলেন নতুন একটি নীল গাড়িতে চড়ে। পরে শুনেছি ওই গাড়িটি ছিল বাংলাদেশ বিমানের কেনা নতুন ১০টি গাড়ির একটি, যা প্রধানমন্ত্রী মোটর পুলকে ধার দেওয়া হয়েছিল ব্যবহারের জন্য। সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ওই একটিই নতুন গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার জন্য সেই দিন পুলিশের দায়িত্ব ছিল। বিশাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘেরাও না করে শুধু অনুষ্ঠান এলাকাটি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ডেলিগেট কিংবা অনুষ্ঠানে আগতদের কোনো ধরনের নিরাপত্তা তল্লাশি ছিল না। সেই সময় মূল প্রোটেকশনের কাজ তদারকি করে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। তাদের সাপোর্ট দিয়েছিল ড্রেসড পুলিশ। তখনও মেট্রো পুলিশ হয়নি ঢাকা শহরে। তখনও এনএসআই হয়নি। ছিল না কোনো মেটাল ডিটেক্টর, আর্চ ডোর, ডগ স্কোয়াড, অত্যাধুনিক কোনো ডিভাইস–যা দিয়ে অনায়াসেই শত্রু চিহ্নিত করা যায়!

বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানস্থলে এলে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় নিয়োজিত মহসীন ভাই গাড়ির দরজা খুলে দেন। সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবির ওপর কালো মুজিব কোট পরিহিত বঙ্গবন্ধুকে একটি খোলা মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই মঞ্চ ঘিরে ছিল বিশ্বের নানা দেশের রাষ্ট্রদূত। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চে ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, যিনি ডাকসুর ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাহবুব জামান ডাকসুর জিএস, আব্দুল কাইয়ুম মুকুল আর নূহ আলম লেলিন। উদ্‌বোধন সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অতিথিদের কোনো বসার চেয়ার দেওয়া হয়নি। মঞ্চে বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেছিলেন। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের সংগীত পরিবেশন করা হয়। কবি-লেখক আক্তার হুসেন ভাইয়ের লেখা 'আমরা তো সৈনিক, শান্তির সৈনিক' গানটি পরিবেশন করা হয় সমবেত কণ্ঠে। শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। এরপর তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে।

আমি সেদিন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের ছবি তুলি প্রথিতযশা বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি খেয়াল করলাম সবার মাঝে ছোট বলে বঙ্গবন্ধু আমার ছবি তোলা লক্ষ করছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে!

উদ্‌বোধনের পর বঙ্গবন্ধু মূল মঞ্চে ঢোকার পথে স্বাক্ষর দিয়ে পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুকে শামিয়ানার ভেতরে পোস্টার প্রদর্শনীতে নিয়ে আসেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। শামিয়ানার ভেতরে স্বল্পপরিসরে ১০/১২ জন আলোকচিত্রী, বয়োজ্যেষ্ঠ আর সবাই বিখ্যাত। তাঁদের ফাঁকফোকর গলিয়ে আমি আমার ক্যামেরায় ছবি তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে জায়গা না দিলেও হাসিমুখে বিনয় দেখাচ্ছি। আমি বঙ্গবন্ধুর এতটাই কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দিতে পারি। এমন সময় দারুণ এক ছবি উঠে আসে আমার ক্যামেরায়।

বঙ্গবন্ধু যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পোস্টার দেখছিলেন। দেখছিলেন চিলির বিপ্লবী ডাক্তার সাল্‌ভেদর আলেন্দের পোস্টার, দেখছিলেন কিউবার বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রোকে, দেখছিলেন বিপ্লবী চে গুয়েভারাকে। ঠিক তখন ১০ বছরের দুই টোকাই দারুণ কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে পোস্টার প্রদর্শনীর পর্দা তুলে বঙ্গবন্ধু দর্শনে ব্যস্ত!

অবিস্মরণীয় ওই ছবিটি স্বনামধন্যদের মাঝে আমার কাছে ধরা দিল। আজ সেই ছবিটি বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তাহীনতার এক ঐতিহাসিক দলিলসম।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী, আবাহনীর প্রতিষ্ঠাকালীন ফটোগ্রাফার

বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যভাবনা

অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

যাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীটিই এই জাতির পথচলায় সারা জীবনের পাথেয় কিংবা যাঁর রাজনীতিকে অনুসরণ করতে গিয়ে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন হয়ে দাঁড়িয়েছিল হাজারের পর হাজার পৃষ্ঠার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেই বাঙালির জীবনের যেকোনো একটি অংশই তো একেকটি উপাখ্যান। অমন বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবনের কোনো একটা অংশ নিয়ে আলোচনার দুঃসাহস দেখানোর মতো ন্যূনতম সাহস আমার নেই, যোগ্যতার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারপরও একজন চিকিৎসক হিসাবে স্বাস্থ্য খাতে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্বন্ধে লিখতে বসা। স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মতো। আর এ পুরো সময়টায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে শূন্য কোষাগার আর ধ্বংসস্তূপের বাংলাদেশটাকে একদিকে যেমন পুনর্নির্মাণে, তেমনই অন্যদিকে স্বাধীনতাবিরোধী থেকে শুরু করে জাসদ তথা গণবাহিনী নামধারী নব্য বিপ্লবীদের সামলানো আর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত মোকাবিলায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, তিনি যখনই কোনো প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করতে যান, সেখানেই দেখেন যে এর শুরুটা তাঁর অনেক আগেই জাতির পিতা করে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু থেকে শুরু করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র–এ সবকিছুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উদাহরণ মাত্র। বঙ্গবন্ধু এহেন প্রজ্ঞার অনেক উদাহরণই প্রত্যাশা অনুযায়ী রয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য খাতেও। এদেশের স্বাস্থ্যের পরতে পরতে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর 'ফুটপ্রিন্ট'। তৎকালীন থানা, আজকের উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করে তিনি যেমন একদিকে কেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্যসেবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সর্বস্তরের মানুষের দোরগোড়ায়, তেমনই অধুনালুপ্ত আইপিজিএমআর, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে টারশিয়ারি স্বাস্থ্যসেবার ভিত্তিটুকু রচনা করে দিয়েছে।

সেই সময়কার 'শুধু নাই আর নাই'-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সন্ত্রস্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতেও একদিন ঘুরে দাঁড়াবে। একদিন বাংলাদেশেরও প্রয়োজন হবে চিকিৎসা খাতে মৌলিক গবেষণার। বাংলাদেশ একদিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, তিনি যখনই কোনো প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করতে যান, সেখানেই দেখেন যে এর শুরুটা তাঁর অনেক আগেই জাতির পিতা করে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু থেকে শুরু করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র–এ সবকিছুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উদাহরণ মাত্র

দাবি করবে নিজস্ব উদ্ভাবিত ওষুধ আর নিজস্ব প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ভ্যাকসিন। জাতিসংঘ আর দাতা সংস্থার দানের ওষুধে চিকিৎসা গ্রহণে অভ্যস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জেনারেশন আর তাদের উত্তরসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক হবে যোজন-যোজনের। তাদের কৃষিবিদরা যখন ৫৫ হাজার বর্গমাইলে ফসল উৎপাদন আর পোলট্রি পালনে রেকর্ড গড়বেন, তখন তাদের চিকিৎসকরাও প্রেসক্রিপশনে নিজেদের উদ্ভাবিত ওষুধ লেখবেন, সেটাই একদিন বাঙালির প্রত্যাশা হয়ে দাঁড়াবে। ভবিষ্যৎটাকে অনেক দূর থেকে দেখার যে অসম্ভব প্রজ্ঞা স্রষ্টা তাঁকে দিয়েছিলেন, সেই প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাবান বঙ্গবন্ধু দেখতে পেয়েছিলেন–এ জাতি যদি আগামী দিনে উন্নততর আর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে এবং বাড়বাড়ন্ত হতে চায়, তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা আর চিকিৎসাবিজ্ঞানী তৈরিতে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হবে।

বঙ্গবন্ধুর সেই দূরদৃষ্টির ফসল তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এদেশের দুটি অসাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যার একটি সরাসরি চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চা আর প্রসারের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর অন্যটির ম্যান্ডেট আরও বৃহৎ পরিসরের হলেও চিকিৎসাবিজ্ঞান সেখানে আছে অনেকখানি জায়গাজুড়েই। এর প্রথমটি হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আর দ্বিতীয়টি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস। দুটি প্রতিষ্ঠানকেই স্বায়ত্তশাসনের শক্তিতে বলীয়ান করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ড. কুদরত-ই-খুদার মতো বিজ্ঞানী ছিলেন বিজ্ঞান একাডেমির প্রথম সভাপতি, যা বলে দেয় কতদূর চিন্তা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে। বঙ্গবন্ধুর ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালেই অনেক না মেলা অঙ্কের উত্তর মিলে যাবে। আমার সুযোগ হয়েছে এ দুটি প্রতিষ্ঠানকেই খুব কাছ থেকে দেখার এবং আমি এও জানি–এ সুযোগ এদেশের খুব বেশি চিকিৎসকের হয়নি। কারণটাও অঙ্ক করেই বলে দেওয়া যায়। বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের চিকিৎসক ফেলোর সংখ্যা গুনতে দুই হাতের দশ আঙুলের প্রয়োজন পরে না। স্বাধীনতার পরপরই প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান দুটি স্বাধীনতার এতদিন পর যে বহুদূর এগিয়েছে, সেটা তো বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ভবন, যা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী ও সম্প্রসারমাণ। দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন মোমেন্টাম জোগান দেওয়ার লক্ষ্যে এই কাউন্সিলের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির গবেষণাগারও। বিজ্ঞান একাডেমিও সাম্প্রতিক সময় খুঁজে পেয়েছে সুরম্য ঠিকানা, পরিসরে যদিও বা অত্যন্ত সীমিত। পাশাপাশি এই সময়টায় এ দুটো প্রতিষ্ঠান গবেষণায়ও অনেক অবদান রেখেছে। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য, ধসে পড়া যে বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু আজকের বাংলাদেশের জন্য এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে এদের এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ। বিজ্ঞান একাডেমি বিজ্ঞানের অন্যান্য আঙিনায়, বিশেষ করে কৃষিবিজ্ঞানে যে অবদানটুকু রেখেছে, সেই মাপে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের অবদান তুলনায় আসে না। অন্যদিকে শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার অ্যাজেন্ডা নিয়ে চর্চা করায় রিসার্চ কাউন্সিলের ফুটপ্রিন্টগুলো তুলনামূলকভাবে এই সেক্টরে অনেক বেশি দৃশ্যমান হলেও সেসব নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলায় এতটুকুও তৃপ্তি নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই চিকিৎসকদের চিকিৎসাবিজ্ঞানবিমুখতায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন, উৎসাহ দেন আর প্রতিশ্রুতি দেন সর্বাত্মক সহযোগিতার। প্রধানমন্ত্রী যথারীতি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণায় ফি বছর জোগান দিয়ে চলেছেন শতকোটি টাকার রিসার্চ ফান্ড। তাঁর মুখ উজ্জ্বল করার মতো রিসার্চের জায়গাটা আমরা চিকিৎসকরা এখনো ছুঁয়ে দেখতে পারিনি। বায়োমেডিক্যাল কিংবা ক্লিনিক্যাল ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ বলতে যা বোঝায়, সেই জায়গাগুলোয় আমাদের শেকড় এখনো খুব একটা গভীর না। আমি পেশায় চিকিৎসক, মূলত ক্লিনিশিয়ান। যে দেশে আমরা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে উত্তরণ ঘটাতে পারলাম কিংবা যমুনার দুকূলকে বেঁধে দিয়ে, এমনকি জুড়ে দিতে পারলাম পদ্মার দুকূলও, সেখানে আমার চিকিৎসা শাস্ত্র কেন এত পেছনে–এর ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন আছে বৈকি। সেই যোগ্যতা আমার না থাকলেও চিকিৎসকদের কোনো সমাবেশে সংযুক্ত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন এদেশে বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে বলতে শুনি, তখন আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলটির পেশাভিত্তিক উত্তরণ আর বিজ্ঞান একাডেমিটির ক্ষমতায়নের ভেতরে সম্ভবত এই পরিস্থিতির উত্তরণ অনেকটাই নিহিত। আমি বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে আগামীর চিকিৎসা খাত।

লেখক: অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ছিল নিষিদ্ধ সংবাদ

জুলফিকার আলি মাণিক

বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তুলে ধরে তখন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতাসীন হওয়ার খবরের ভেতর শুধু বঙ্গবন্ধু 'নিহত' বলে এক টুকরো তথ্য দেয়, তাও শেখ মুজিবের নামের আগে ঐতিহাসিক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধির ব্যবহার রাতারাতি বর্জন করে। বঙ্গবন্ধুকে কারা, কখন, কীভাবে হত্যা করেছে, এ সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ লেখেনি। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের আরও সাতজন সদস্যকে হত্যা করার তথ্যও প্রকাশ করেনি।

সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কখনোই সাংবাদিকতাচর্চার প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় দেশে চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেগুলো হলো–বাংলা ভাষার দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার বাংলাদেশ টাইমস ও দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। এর মধ্যে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমস রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও দ্য বাংলাদেশ অবজারভার তখন জাতীয়করণ করা ব্যক্তিমালিকানাধীন পত্রিকা ছিল। সেগুলোর মধ্যে বর্তমানে একমাত্র দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়, অন্য তিনটি পত্রিকার প্রকাশনা বিভিন্ন সময় বন্ধ হয়ে গেছে।

এ চারটি সংবাদপত্র ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্টের সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মতো নজিরবিহীন নৃশংসতম রাজনৈতিক-সামরিক সন্ত্রাসী অপরাধের ঘটনা নিয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পাতার বামদিকে সবার ওপরে প্রধান খবরের জায়গায় দুই কলামে বক্স করে সম্পাদকীয় ছাপে, যা দেশের সাংবাদিকতায় খুবই অস্বাভাবিক চর্চা। তাও আবার সেই সম্পাদকীয় ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতার পট পরিবর্তনকে সমর্থন করে, যার শিরোনাম ছিল–'ঐতিহাসিক নবযাত্রা'। সম্পাদকীয়টির পাশে অর্থাৎ, প্রথম পাতার ডানদিকে সবার ওপরে দ্বিতীয় প্রধান খবর হিসাবে ৬ কলামে নিজেদের তৈরি প্রতিবেদন প্রকাশ

করে, যার শিরোনাম ছিল–'খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ'। এই বড়ো শিরোনামের সঙ্গে কোথাও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর ছিল না। এ শিরোনামের অধীনে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির ভেতর খুবই দায়সারাভাবে শুধু বঙ্গবন্ধু 'নিহত' হওয়ার এক টুকরো তথ্য দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিবেদনটির শুরুর অনুচ্ছেদে বলে, 'রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুশতাক আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গতকাল প্রত্যুষে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।' এরপর ইত্তেফাক প্রতিবেদনটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জানায়, 'শাসনভার গ্রহণকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে নিহত হইয়াছেন।' এটুকু ছাড়া বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা নিয়ে আর কোনো তথ্য ইত্তেফাক সেদিন ছাপেনি।

বঙ্গবন্ধু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ভোরে রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে সেনাবাহিনীর একদল সদস্যের সশস্ত্র হামলায় নিহত হন। একই সময় তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন পুত্র–শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল; দুই পুত্রবধূ–সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল এবং ভাই শেখ নাসের নিহত হন। সেদিন সকালেও প্রকাশিত ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় দুই কলামে প্রধান শিরোনাম ছিল–'বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা বিশেষ ক্রোড়পত্রে ইত্তেফাক বঙ্গবন্ধুর ছবির ওপর লিখে 'জাতির জনক'। অথচ হত্যাকাণ্ডের পরদিনের পত্রিকায় নিহত হওয়ার এক টুকরো তথ্য দেওয়ার সময় শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু'র ব্যবহার বর্জন করে ইত্তেফাক।

১৯৭৫ সালে ইত্তেফাক দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা হিসাবে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে থেকেই ইত্তেফাক এবং পত্রিকাটির মালিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একটি বহুলপ্রচলিত তথ্য। স্বাধীনতাসংগ্রাম ও একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে ইত্তেফাকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও সবার জানা।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পত্রিকা 'দৈনিক বাংলা' ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট তাদের শীর্ষ প্রতিবেদনের শিরোনাম করে ৮ কলামে, যা ছিল–'খোন্দকার মুশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি'। এই মূল শিরোনামের ওপরে ছোটো অক্ষরে লেখে–'শেখ মুজিব নিহত ঃ সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি ঃ সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ'। দৈনিক বাংলার শিরোনামটিই ইংরেজিতে 'বাংলাদেশ টাইমস' তাদের প্রধান শিরোনাম করে।

দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমস তাদের প্রধান শিরোনামের নিচে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)'-এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ফলে এ দুই পত্রিকায় ভাষার পার্থক্য ছাড়া প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য ছিল এক। দৈনিক বাংলার প্রতিবেদনের শুরুর অনুচ্ছেদ ছিল–"শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করে। সশস্ত্র বাহিনীর এই ক্ষমতা গ্রহণের সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে নিহত হন বলে ঘোষণা করা হয়।"

ইত্তেফাকের মতোই বাসস, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমস পঁচাত্তরের ১৬ আগস্ট থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' লেখা বন্ধ করে। দেশের কোনো পত্রিকা থেকে সেই সময় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা ও বর্বরতা সম্পর্কে দেশবাসীর বিন্দুমাত্র কিছু জানার এমনকি অনুমান করার সুযোগ ছিল না। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিবারের আরও সাতজনসহ ১১ জন নিহত হয়েছেন, সেই তথ্যও দেশের সংবাদপত্র থেকে তখন জানতে পারেনি দেশের মানুষ।

'দ্য বাংলাদেশ অবজারভার' পত্রিকাও বাসস পরিবেশিত খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রতিবেদন প্রথম পাতার শীর্ষ সংবাদ হিসাবে ছাপে। অবজারভার ৮ কলাম শিরোনাম করে। বড়ো অক্ষরে প্রধান শিরোনাম ছিল–'মুশতাক বিকামস প্রেসিডেন্ট'। এর ওপরে ছোটো অক্ষরে 'আর্মড ফোর্সেস টেক ওভার ঃ মার্শাল ল' প্রোক্লেইমড ঃ কারফিউ ইমপোজড' এবং নিচে 'মুজিব কিল্ড ঃ সিচুয়েশন রিমেইন্স কাম' লেখা ছিল।

বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক বাংলা প্রথম পাতায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেয় 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' এবং অবজারভারের সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি'। বাংলাদেশ টাইমসও প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে একই ধরনের লেখা প্রকাশ করে। কিন্তু টাইমস সেটাকে সম্পাদকীয় হিসাবে অভিহিত না করে নিজেদের মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করে। টাইমস লেখাটির শিরোনাম দেয় 'আওয়ার কমেন্ট ঃ অন দ্য থ্রেশহোল্ড অব নিউ এরা'। নিজেদের মন্তব্য বা সম্পাদকীয়, যে নামেই অভিহিত করুক না কেন, মূলত চারটি পত্রিকাই এসব লেখায় বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষমতা দখলের পক্ষে সাফাই গেয়েছে।

চারটি সংবাদপত্রই পঁচাত্তরের ১৬ আগস্ট একটিমাত্র বাক্যে বঙ্গবন্ধু 'নিহত' হওয়ার তথ্য দিলেও কোনো পত্রিকাই জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুখচ্ছবি পর্যন্ত ছাপেনি। সব পত্রিকা প্রধান ছবি হিসাবে বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেওয়ার দৃশ্য ছাপে। এর মধ্যে ছবি নিয়ে সবচেয়ে অস্বাভাবিক কাজ করে দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। ইংরেজি দৈনিকটি প্রথম পাতার ভাঁজের ওপরেই ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাকের তিনটি ছবি ছাপে। এর মধ্যে একটি মোশতাকের শপথ নেওয়ার দৃশ্য, আরেকটি রাষ্ট্রপতি মোশতাক শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহকে এবং তৃতীয়টি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর জাতির উদ্দেশে মোশতাকের ভাষণ দেওয়ার ছবি।

বহু বাধা পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার শুরু করতে ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তেমনই সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার বর্বরতা ও নৃশংসতার ঘটনা বহু বছর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলোয় উপেক্ষিত ছিল। ফলে দেশের সবচেয়ে নির্মম, কলঙ্কজনক, ঘৃণ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সত্য সাধারণের অজানা থাকে দুই দশকের বেশি সময়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দীর্ঘ ধারাবাহিক সামরিক শাসনকালে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন, বেতার, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্র কঠোরভাবে সামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বিচারিক আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগে বলা হয়, 'আসামিরা হত্যাকাণ্ডের অপরাধকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে এবং ষড়যন্ত্র ও হত্যার দায় থেকে নিজেদের

বাঁচাতে রেডিয়োসহ বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের মাঝে বানোয়াট, মিথ্যা, ভুয়া এবং উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করে।'

বিগত দশকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ দুটি ভিন্ন মামলায় মোশতাক, সায়েম, জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনামল ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং এজন্য তাদের বিচার করা ও সাজা প্রদানের সুযোগ সম্পর্কেও পরামর্শ দেয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবাদপত্রগুলো খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের ভাষণ, বক্তৃতা এবং সামরিক শাসনসংক্রান্ত খবর প্রধান গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদিন প্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডর দুদিন পর ১৭ আগস্ট দৈনিক বাংলা ২৬ শব্দে বঙ্গবন্ধুর দাফনের খবর প্রকাশ করে। 'পূর্ণ মর্যাদায় সাবেক রাষ্ট্রপতির লাশ দাফন' শিরোনামে এক বাক্যের প্রতিবেদনটি ছিল এরকম: 'সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ শনিবার বিমানযোগে ফরিদপুরের টুঙ্গীপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।' এরপর আরেকটি বাক্যে এ তথ্যের উৎস উল্লেখ করে পত্রিকাটি বলে–"একজন সরকারী মুখপাত্র একথা জানান বলে গতকাল বাসস'র খবরে বলা হয়।"

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা দুই দশকের বেশি সময় পর সবিস্তারে জনসমক্ষে আসতে শুরু করে। তখন বেরিয়ে আসে কতটা জঘন্য অবহেলায় সশস্ত্র সেনাদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মরদেহ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করতে বাধ্য করা হয়েছিল গ্রামবাসীকে। বঙ্গবন্ধুকে দাফন করার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট দুপুর ২টায় বঙ্গবন্ধুর কফিন বহনকারী সামরিক হেলিকপ্টার টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছায়। সেনাবাহিনীর ১৫-১৬ জন সশস্ত্র সদস্য হেলিকপ্টার থেকে নেমেই চারদিকে অবস্থান নেয়। টুঙ্গিপাড়ার কয়েকজন অধিবাসী ও সৈনিক হেলিকপ্টার থেকে বঙ্গবন্ধুর কফিন নামিয়ে তাঁর বাড়িতে দাফনের জায়গায় নিয়ে যায়। এরপর কফিনের ডালা খোলা হলে উপস্থিত টুঙ্গিপাড়ার গ্রামের কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর মরদেহ দেখতে পান। তারা লক্ষ করেন–বঙ্গবন্ধুর বুকে, হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির ক্ষতচিহ্ন ছিল। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপরের অংশ ছিল না। দুই পায়ের গোড়ালির ওপরে রগ কাটা ছিল। সেনাবাহিনীর লোকজন বঙ্গবন্ধুর দেহ যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই কবর দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেখানে উপস্থিত কেউ কেউ বলেছিলেন, 'মুসলমানের লাশ গোসল, জানাজা, কাফন ইত্যাদি ছাড়া দাফন করা ঠিক হবে না।' তখন সেনা সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর মরদেহের গোসল ও জানাজার জন্য ১০ মিনিট সময় দেয়। গ্রামবাসীদের কয়েকজন দ্রুত স্থানীয় রেড ক্রস হাসপাতালে গিয়ে তিনটি সাদা শাড়ি ও একটি দোকান থেকে দুটি ৫৭০ সাবান (সেসময় এই সাবান কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো) নিয়ে আসেন। স্থানীয় মসজিদের ইমামকে ডেকে আনেন। গোসল দেওয়ার আগে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা সুরতহাল করতে দেয়নি। এরপর কয়েকজন গ্রামবাসী বঙ্গবন্ধুর মরদেহের গোসল দেয়। তারা লক্ষ করে বঙ্গবন্ধুর দেহে রক্তমাখা সাদা পাঞ্জাবি, গেঞ্জি ও লুঙ্গি ছিল। কফিনে বঙ্গবন্ধুর কালো ফ্রেমের চশমা, একটি পাইপ ও এক জোড়া সেন্ডেল ছিল। গোসলের পর ইমাম ও কয়েকজন গ্রামবাসী মিলে কাফনের কাপড় হিসাবে সাদা শাড়িগুলো দিয়ে বঙ্গবন্ধুর দেহ ঢাকে। স্থানীয় মসজিদের ইমাম বঙ্গবন্ধুর জানাজা পড়ান। চারদিক থেকে গ্রামের লোকজন জানাজায় অংশগ্রহণ করতে চায়; কিন্তু সেনা সদস্যরা তাদের বাধা দেয়, সবাইকে জানাজায় দাঁড়াতে দেয়নি। মাত্র ২০-২৫ জন গ্রামবাসী জানাজা পড়ার অনুমতি পায়। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়। এরপর সেনাবাহিনীর দেওয়া একটি প্যাডে বঙ্গবন্ধুর 'লাশ বুঝিয়া পাইয়া দাফন করার' সার্টিফিকেট লিখে দেয় উপস্থিত স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবাদপত্রগুলো কার্যত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বাধীন সামরিক প্রশাসনের মুখপত্রে পরিণত হয়। পঁচাত্তর সালের শেষে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরও সংবাদপত্রগুলো বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো তথ্য ও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনি।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন। দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক থাকাকালে ২০১৪ সালে তোয়াব খান এই লেখককে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে সাক্ষাৎকার দেন। তোয়াব খান জানান, 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সংবাদপত্রগুলোকে অবৈধ সরকারের সরবরাহ করা কিংবা তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী সবকিছু প্রকাশ করতে হয়েছিল।'

একই প্রসঙ্গে ২০১৪ সালে আরেকজন বর্ষীয়ান সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার এই লেখককে সাক্ষাৎকার দেন। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবাদপত্রের ওপর 'টোটাল সেন্সরশিপ' আরোপ করা হয়। গোলাম সারওয়ার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'তখন সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষগুলোর সামরিক জান্তার কথা অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি ছিল না। যার ফলে পত্রিকার সাংবাদিকরাও তখন সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে কোনো সাহসিকতার পরিচয় রাখতে পারেনি। তখন পরিস্থিতি সাংবাদিকদের অনুকূলে ছিল না। সংবাদপত্রের মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গিয়ে সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা করার সুযোগ ছিল না।' বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় ইত্তেফাক গ্রুপের সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'র নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন গোলাম সারওয়ার, তাঁর জীবনাবসান ঘটে ২০১৮ সালে।

আরেকজন বর্ষীয়ান সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা গ্রুপের সাপ্তাহিক প্রকাশনা 'বিচিত্রা'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ২০১৪ সালে এই লেখককে একই প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার দেন। শাহরিয়ার কবির বলেন, 'আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড কভার (প্রতিবেদন তৈরি) করার জন্য আমাদের প্রতিবেদককে অ্যাসাইন করার (রিপোর্টিংয়ের দায়িত্ব দেওয়ার) চেষ্টা করেছি; কিন্তু তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে তা করতে দেয়নি।'

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
২. দৈনিক বাংলা, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
৩. দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
৪. বাংলাদেশ টাইমস, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
৫. দৈনিক বাংলা, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫।
৬. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারিক আদালতের নথি।
৭. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী পুলিশ কর্মকর্তা শেখ আবদুর রহমানের জবানবন্দি।
৮. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী আবদুল হাই শেখের জবানবন্দি।
৯. ঢাকা ট্রিবিউনের প্রতিবেদন 'সেন্সরশিপ ইন দ্য ট্রু সেন্স,' ১৫ আগস্ট ২০১৪।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

স্মার্ট কৃষি গড়তে বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা

নিরঞ্জন রায়

১৯৭৫ সালের এই আগস্ট মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেভাবে সপরিবারে হারিয়েছি, তেমনটা সামসময়িক বিশ্বে আর কোথাও হয়েছে কি না, আমাদের জানা নেই। এই কালদিনে আমরা যে শুধু বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছি তেমন নয়, সেই সঙ্গে হারিয়েছি বাঙালি জাতিকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, ভাবনা ও আদর্শকে। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর ছিল কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, দর্শন ও ভাবনা; যার মধ্যে কৃষি খাত এবং কৃষকের উন্নতি অন্যতম।

বঙ্গবন্ধু প্রথম থেকেই বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি এবং আর্থসামাজিক উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে ধাপে ধাপে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি সফল নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে স্বাধীন করে নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ সফল হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে নিয়ে তাঁর অন্যসব ভাবনা, আদর্শ ও দর্শন বাস্তবায়নের সুযোগই পেলেন না। এর আগেই ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি এবং আর্থসামাজিক উন্নতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর যে দর্শন, ভাবনা এবং পরিকল্পনা, তা মূলত অসমাপ্তই থেকে যায়। কিছুটা সৌভাগ্য যে, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটানা বেশ কয়েক বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর কিছু অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন। আর এ কারণেই দেশ আজ এগিয়েছে অনেকদূর। দেশে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হতে পেরেছে।

আমাদের আরও দুর্ভাগ্য, বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং ভাবনাগুলো আমাদের সেভাবে জানার সুযোগ হয়নি। কেননা তিনি সেগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ যেমন পাননি, তেমনই সেভাবে লিখেও রেখে যেতে পারেননি। সামান্য কিছু ভাবনা ও পরিকল্পনার

কথা নিজের আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন মাত্র এবং কিছু ধারণা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তথ্য আদান-প্রদান থেকে পাওয়া যায়। এসব বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করায় আমরা সাধারণ মানুষ কিছুটা জানতে পেরেছি। এর বাইরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, ভিশন ও দর্শনের ভালো প্রকাশ ঘটেছিল বাকশাল কর্মসূচির মাধ্যমে। কিন্তু এ কর্মসূচিকে আলোর মুখ দেখতে দেওয়া হয়নি। কতটা ভালো আর কতটা খারাপ, তা বুঝে ওঠার সুযোগই পাওয়া যায়নি। জন্মের আগেই হত্যা করা হয়েছে এই বাকশাল কর্মসূচিকে। অথচ বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর যেসব সামরিক শাসক রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাদের সবাই কিছু দফা জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, যার অনেক দফাই এই বাকশাল কর্মসূচি থেকে নেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন বা এগুলো নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জাতির সামনে তুলে ধরবেন বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং ভাবনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষির উন্নতি এবং কৃষকের ভাগ্য উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু কৃষকের সঙ্গে মিশেছেন একেবারে একাত্ম হয়ে। আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন। ফলে বাংলার কৃষকদের খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। নিজের চোখে দেখেছেন কৃষক কত কষ্ট করে ফসল ফলায় এবং দেশের মানুষের জন্য অন্ন জোগায়। বঙ্গবন্ধু কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা যেভাবে দরদ দিয়ে দেখেছেন, তেমনটা আগে কেউ সেভাবে দেখেননি। এ কারণেই তিনি বাংলার কৃষকের কথা ভাবতেন সব সময় এবং তাঁর কাছে কৃষকের গুরুত্ব ছিল সবার ওপরে। বঙ্গবন্ধু বাকশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন এবং সেখানেও তিনি কৃষককেই প্রথমে রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু কৃষকদের এতটাই অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন যে তিনি তাঁর একাধিক বক্তৃতায় কৃষকদের সম্মান করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন, 'আমার কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ।' বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনই দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়েছে এবং ত্বরান্বিত করেছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি। বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন কৃষিদর্শন, যার কিছুটা বাস্তবায়ন করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর সময়ের তুলনায় দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আড়াই গুণ। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন সাড়ে ১৭ কোটি জনসংখ্যায় পরিণত হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য খাদ্যঘাটতি থাকলেও সাড়ে ১৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে এখন খাদ্যঘাটতি মিটিয়ে যৎসামান্য রপ্তানিও হচ্ছে। কৃষির এই অভাবনীয় সফলতা সম্ভব হয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা বিবেচনায় নিয়ে কৃষিনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায়।

বঙ্গবন্ধু যে শুধু কৃষকের দুঃখ-দুর্দশাই উপলব্ধি করেছেন তেমন নয়। সেই সঙ্গে আমাদের কৃষকের যে দক্ষতা, কৃষিকাজে বিশেষ পারদর্শিতা এবং কৃষিকাজের যে অভিজ্ঞতা, তাও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি এড়ায়নি। এ কারণেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কীভাবে গড়ে তোলা হবে–এ ব্যাপারে একজন বিদেশি সাংবাদিক যখন বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছিলেন–'আমার দেশের মাটি ও কৃষক আছে। আমি তা দিয়েই দেশের উন্নতি করতে পারব।' দেশের কৃষি ও কৃষকদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্যই বঙ্গবন্ধু এরকম মন্তব্য করতে পেরেছিলেন। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে বঙ্গবন্ধু আমাদের দেশের মাটি এবং কৃষকদের নিয়ে যে উচ্চাশা প্রকাশ করেছিলেন, তা আজও কার্যকর। আমাদের দেশের মাটি যত উর্বর, বিশ্বের আর কোনো দেশের মাটি এতটা উর্বর কি না, জানা নেই। তবে উন্নত বিশ্বের মাটি যে আমাদের দেশের মাটির উর্বরতার ধারে-কাছেও নেই, তা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যেতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বে কোনো ফসল ফলানোর জন্য তিন মাস মাটি বা জমি প্রস্তুত করতে হয় এবং হরেক রকমের সার প্রয়োগ করতে হয়। অথচ আমাদের মাটিতে বীজ ফেলে রাখলেই গাছ হয়ে যায় এবং তাতে ফলও ধরে। কিছু সার হয়তো দিতে হয়; কিন্তু এর পরিমাণ তুলনামূলক অনেক কম। আর আমাদের কৃষকদের দক্ষতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাদের ঘড়ির প্রয়োজন পড়ে না। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় বলে দিতে পারেন। আবহাওয়াবিদদের তথ্যের ওপর কৃষককে নির্ভর করতে হয় না। তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই নির্ধারণ করতে পারেন কখন ফসল রোপণের উপযুক্ত সময়, কখন ফসলের পরিচর্যার সঠিক সময় এবং কখন ফসল কাটার সঠিক সময়। এ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োগ করেই আমাদের দেশের কৃষক প্রতিবছর বাম্পার ফলন ঘরে তুলছেন। যাঁরা আমাদের দেশের কৃষকদের চারা রোপণ এবং চারাগাছ নিড়ানোর দৃশ্য দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের দক্ষতার মাত্রা কত ওপরে। উন্নত বিশ্বের কৃষিকাজে এসব কিছু দৃশ্য আমার দেখার সুযোগ হয়েছে এবং সেখান থেকে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি যে আমাদের দেশের কৃষকের দক্ষতার কাছেও কেউ নেই।

কৃষির বহুমুখীকরণ বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনার মধ্যেই পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, বছরে একটি বা দুটো ফসল ফলিয়ে কৃষকের ভাগ্যের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো তিনি বহুমুখী কৃষি উৎপাদনের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। যে গাছ লাগানোর কথা তিনি আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে ভেবেছিলেন এবং নিজে বৃক্ষরোপণকে গুরুত্ব দিয়ে অনেক কর্মসূচিতেও অংশ নিয়েছেন, সেই বৃক্ষরোপণ এতদিনে এসে উন্নত বিশ্বে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। আমাদের দেশেও ফলবান বৃক্ষের গাছ লাগিয়ে কৃষির বহুমুখীকরণ শুরু হয়েছে বেশ জোরেশোরেই। দেশি ফল ছাড়াও অনেক বিদেশি ফলের গাছ লাগিয়ে অভূতপূর্ব সফলতা পাওয়া গেছে। একসময় যেসব ফল খুবই সীমিত পরিসরে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো, এখন সেসব ফল দেশেই ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয়, যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। আজকের বাংলাদেশে আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত ফল বিদেশে রপ্তানির যে অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এর শুরুটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি গুরুত্বের সঙ্গেই দ্বিগুণ ফসল উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ ডবল ফসল উৎপাদন আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা। এখন একাধিক বা ডবল বা ট্রিপল ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে একই জমি একসঙ্গে একাধিক ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়েক বছর আগে যশোরের গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং সেখানে দেখেছি যে একই জমির ওপরে মাচা করে বিন এবং লাউজাতীয় ফসল আর এর নিচেই উৎপাদিত হচ্ছে মরিচ এবং বেগুনজাতীয় ফসল। পুকুরে মাছচাষের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন এবং এর চারপাশে উৎপাদিত হয় পেঁপে, কলাসহ হরেক রকম ফসল। এখন তো কচুরিপানার ওপরও ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। এ এক অভিনব পদ্ধতির কৃষি উৎপাদন, যা সম্ভবত বাংলাদেশেই সম্ভব। কৃষির বহুমুখীকরণের যে পদ্ধতি শুরু হয়েছে, এখন একে আরও সন্নিবেশিত করতে হবে এবং একে স্থায়ী রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

কৃষিতে ভরতুকি সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলেও এই ভরতুকি অপরিহার্য হয়ে গেছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশে, এমনকি উন্নত বিশ্বেও কৃষিতে ভরতুকি দেওয়া হয়ে থাকে।

কৃষির বহুমুখীকরণ বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনার মধ্যেই পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, বছরে একটি বা দুটো ফসল ফলিয়ে কৃষকের ভাগ্যের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো তিনি বহুমুখী কৃষি উৎপাদনের কথা জোর দিয়ে বলেছেন

উন্নত বিশ্বের ভরতুকির ধরন অবশ্য ভিন্ন। তারা কখনো কৃষিতে ট্যাক্স রিবেট বা কর সুবিধা দিয়ে থাকেন আবার কখনো সুবিধাজনক মূল্যে কৃষি উপকরণ দিয়ে থাকেন। অবশ্য কৃষির ভরতুকি সব সময়ই প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষিদের দেওয়া হয়ে থাকে। যাঁরা বৃহৎ খামারের বা ফার্মের মালিক, তাঁরা সেভাবে ভরতুকির আওতায় আসেন না। এটি যেমন আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের বেলায় প্রযোজ্য, তেমনই উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। উন্নত বিশ্বে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে যারা আগ্রহী, তাদের নামমাত্র মূল্যে জমি বরাদ্দ দিয়ে চাষ করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেখানে চাষবাসের জন্য যে পানি ও অন্যান্য উপাদান প্রয়োজন, তাও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসবই কোনো না কোনোভাবে ভরতুকির আওতায় পড়ে। আমাদের দেশে যে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের সার ক্রয়ের সুযোগ বা সেচব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া হয়, তা মূলত কৃষিতে ভরতুকিরই অংশ। কৃষিতে ভরতুকি নিয়ে একসময় আমাদের দেশের কৃষকদের দুর্ভোগের শেষ ছিল না। কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরাসরি ভরতুকির অর্থ প্রদান করায় সেই দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। কৃষকদের ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়ে সেই হিসাবে সরাসরি বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভরতুকির অর্থ দেওয়ার ফলে কৃষকের জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশের সার্বিক উন্নতিতে কৃষির অবদান কখনই শেষ হওয়ার নয়। যতই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটুক না কেন, কৃষির গুরুত্ব বাড়বে ছাড়া কমবে না। এখনো আমাদের দেশজ জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপিতে) কৃষির অবদানই সর্বোচ্চ এবং আগামী দিনেও যে এই খাতের অবদান শীর্ষে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং কৃষি খাতের অগ্রযাত্রাই দেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করবে। কেননা কৃষি খাত একদিকে যেমন শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করে, অন্যদিকে তেমনই কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ভূমিকা রেখে থাকে। ফলে আগামী দিনে কৃষিতে ভরতুকি শুধু অব্যাহত রাখলেই চলবে না, সেই সঙ্গে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভরতুকি দেওয়াকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে হবে। আগামী দিনে যে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলবে, সেখানেও স্মার্ট কৃষি নির্মাণের কর্মসূচিকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

আমাদের দেশের কৃষকদের চিরদিনের সমস্যা হচ্ছে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করলেও তা উপযুক্ত বাজারমূল্যে কখনোই বিক্রি করতে পারেন না। অভাবের তাড়নায় তাঁরা যে কোনো মূল্যে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। আর এর সুবিধা নিয়ে নেয় মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। আর দারিদ্র্য যাঁদের নিত্যসঙ্গী, তাঁরা নিজেদের অধিকার আদায় করবেন কীভাবে এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্যই বা নিশ্চিত করবেন কীভাবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুও বেশ গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন। তিনি কৃষিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এর একটি স্থায়ী সমাধানের পথও বের করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যেসব সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, তারা কৃষিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তনের ধারণাটা সেভাবে বুঝতেই পারেনি। ফলে সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তন করে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতির সঙ্গে কমিউনিজমের বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলে পশ্চিমা বিশ্বও সমবায় পদ্ধতির বিপক্ষে অপপ্রচার চালায় এবং সামরিক সরকারকে ভুল বুঝিয়ে এই পদ্ধতি থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। অথচ তারা ঠিকই এ সমবায় পদ্ধতিকে অনুসরণ করে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করেছে। এসব দেশে আছে 'হুইট বোর্ড'-এর মতো নানারকম সরকারি সংস্থা, যারা আগে থেকে নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে এর সঙ্গে লাভের অংশ যোগ করে সেই পণ্য বিক্রি করে থাকে। একইভাবে যে বৃহৎ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানেও নিয়মের মারপ্যাঁচে উৎপাদিত পণ্য পূর্বনির্ধারিত ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষক তাঁর উৎপাদিত ন্যায্যমূল্য পায়, অন্যদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে। অথচ আমরা কৃষকদের সমন্বয়ে এই ধরনের কোনো পদ্ধতির প্রচলন আজও চালু করতে পারিনি। আর এরকম সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যও নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এবং সেই সঙ্গে বাজারে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতাও বজায় রাখা যাবে না।

এখন অবশ্য সেই পুরোনো ধারণার সমবায় পদ্ধতির প্রচলন করার সুযোগ নেই এবং এর প্রয়োজনও নেই। এখন ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ হতে চলেছে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক সমবায় পদ্ধতি গড়ে তুলে একদিকে যেমন কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব, অন্যদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতাও বজায় রাখা যাবে। বিএডিসি (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা) বা টিসিবির (ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধানে একটি অনলাইন কৃষি ক্রয়-বিক্রয় প্ল্যাটফরম বা অ্যাপলিকেশন তৈরি করা যেতে পারে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যে অংশ বিক্রির জন্য নির্ধারিত থাকবে, সেই পণ্য তাঁরা তখন কৃষি ক্রয়-বিক্রয় প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে বিক্রি করবে। পক্ষান্তরে যেসব প্রতিষ্ঠান বা মধ্যস্বত্বভোগী

কোম্পানি কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করবে, তারাও এই কৃষি ক্রয়-বিক্রয় প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে ক্রয় করবে। প্রথমে প্রত্যেক কৃষকের একটা নির্দিষ্ট আইডি (একক পরিচিত নম্বর) দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষকের সামর্থ্য অনুযায়ী বড়ো কৃষক, মাঝারি কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, বর্গা কৃষক এবং যাঁরা অন্যের জমিতে কাজ করে পারিশ্রমিক হিসাবে ফসল পেয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য পৃথক আইডির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একইভাবে যাঁরা কৃষিপণ্য ক্রয় করবে, তাঁরাও সরাসরি ক্রেতা, মধ্যস্বত্বভোগী ক্রেতা বা কাঁচামাল ক্রেতা হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন আইডি দিয়ে এই কৃষি ক্রয়-বিক্রয় প্ল্যাটফরমের সঙ্গে নিবন্ধন করবে।

কৃষক এবং কৃষিপণ্য ক্রেতার পাশাপাশি আরেক ধরনের লোক এই অনলাইন প্ল্যাটফরমের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন এবং তাঁরা হচ্ছেন এই বিক্রীত পণ্য পরিবহণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা কোম্পানি। তাদেরকে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে এই পণ্য পরিবহণ কাজের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে এবং তাদেরকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হবে বিধায় জাল-জালিয়াতির ঘটনা, বিশেষ করে পণ্য নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। এই প্ল্যাটফরমে ক্রেতা, বিক্রেতা এবং পরিবহণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে অন্যকে আগে থেকে চিনতে পারবে না। একধরনের 'অনলাইন বিডিং' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কৃষক কত মূল্যে বিক্রি করছেন এবং মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান কত মূল্যে ক্রয় করে তা পুনরায় কত মূল্যে বিক্রি করছে, তা অনলাইনে লিপিবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা আগে থেকে তাঁদের ক্রয়মূল্য অফার করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কৃষক আগে থেকেই তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁরাও নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবেন।

পদ্ধতি এবং কার্যক্রম যতই জটিল হোক না কেন, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে হবে। ফলে আমাদের এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া পদ্ধতিটি সরকারের ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ এবং বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনার সঙ্গেও যথেষ্ট মিল আছে, তাই এই ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করতেই হবে। আমাদের দেশের কৃষকদের যে অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, এর সঙ্গে যখন প্রযুক্তির সহযোগিতা যোগ হবে, তখন এর সফলতা পৌঁছে যাবে অনেক উচ্চতায়। আর এরকমটাই হয়েছে আমাদের বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের কৃষি খাতে, যাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে হবে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশে। দেশ যেভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পথে, তাতে আগামী স্মার্ট বাংলাদেশে হবে স্মার্ট কৃষি, যা বাস্তবায়িত হবে বঙ্গবন্ধুর কৃষিদর্শন এবং কৃষিভাবনার ওপর ভিত্তি করেই।

লেখক: ব্যাংকার, কলামিস্ট

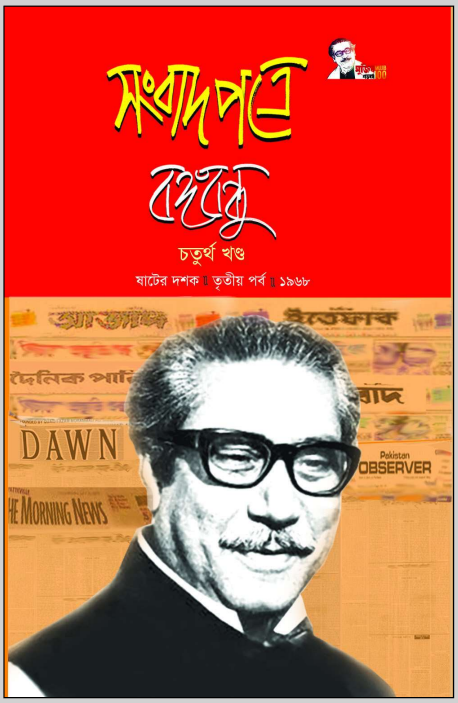

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ইসলামি চেতনায় সমুজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু

মো. জাকির হোসেন

শহর থেকে দূরে–পল্লির এক ছায়াঢাকা গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। প্রকৃতি তার নৈসর্গিক শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে টুঙ্গিপাড়ার পথে পথে। এমনই এক সুন্দর-শোভামণ্ডিত গ্রামে আবির্ভাব ঘটে বাঙালি জাতির মুক্তির অগ্রদূত শেখ মুজিবুর রহমানের। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ মঙ্গলবার রাত ৮টায় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে।

প্রবাদ আছে, মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণকারীরা সাধারণত একরোখা ও জেদি হয়। বঙ্গবন্ধুও অনেকটা সেরকমই যেন। তবে তিনি ছিলেন অন্যায়ের ঘোরতর বিরোধী। নিজে কখনো অন্যায় করতেন না আর কাউকে করতে দেখলে তাও সহ্য করতেন না।

মা-বাবা আদর করে তাঁকে খোকা বলে ডাকতেন। কিন্তু নানা শেখ আব্দুল মজিদ খোকার নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়েরা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে!' 'মুজিব' আরবি শব্দ। পবিত্র কোরআনের সূরা হুদ-এর ৬১নং আয়াতে 'মুজিব' শব্দটি বিদ্যমান। যার অর্থ সাড়া দেওয়া, ডাকের জবাব দেওয়া বা উত্তর দেওয়া। সেজন্যই হয়তো বাঙালি জাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী সাড়া জাগিয়ে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের ভেতরে আধ্যাত্মিকতার ছাপ ছিল। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল প্রবল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ শেখ আবদুল আউয়াল ছিলেন একজন দরবেশ ও আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি বঙ্গবন্ধুর সপ্তম পূর্বপুরুষ। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের সুখ্যাতি ছিল সুফি চরিত্রের অধিকারী হিসাবে।

যুগশ্রেষ্ঠ অলি বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর সঙ্গে দরবেশ শেখ আবদুল আউয়াল ১৪৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এই অঞ্চলে আসেন। এই বংশের প্রায় সবাই ছিলেন বুজুর্গ, দরবেশ, অলি–এককথায়

ইসলামপ্রিয় মানুষ। বঙ্গবন্ধুর ধমনিতেও এই দরবেশ এবং অলিদের রক্ত প্রবাহিত ছিল। চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.), বারো আউলিয়া (রহ.) ও গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.), সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.), হজরত শাহ পরাণ (রহ.), রাজশাহীর শাহ মখদুম (রহ.), খুলনার খানজাহান আলী (রহ.), মিরপুরের হজরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) ও হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (রহ.)-সহ বিভন্ন অলি-দরবেশদের আধ্যাত্মিক ছোঁয়া ছিল বঙ্গবন্ধুর মধ্যেও। অলি, দরবেশ, গাউস, কুতুব ছাড়াও অনেক রাজনীতিক তাঁদের রাজনীতি ও প্রশাসনিক দায়িত্বের মাধ্যমেও পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা দিক ইসলামি চেতনায় জাগ্রত হয়ে আছে। বাঙালি হৃদয়ের তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনাবিল সারল্য, উদারমনা মূল্যবোধ, শত্রুর প্রতি স্নেহ-আচরণ, অহিংস নীতি এবং নিজেকে অন্যের সমতায় নিয়ে এসে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা তাঁর জীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনের বহুধারার মধ্যে অহিংসা ও মানবপ্রেম–এই দুদিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের অগ্নিঝরা ভাষণে বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব–ইনশাআল্লাহ।' নিজের সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার উচ্চারণ, 'আমি মুসলিম, আমি কমিউনিস্ট নই।' তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ছিল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও কুচক্রী মহল তাঁর দলে ইসলামের বিশ্বাস নেই বলে অপপ্রচার চালাত। এর জবাবে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে তিনি এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। আসলে আমরা লেবাসধারী ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হজরত রাসুলে কারিম (সা.)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র।' এমনটাও বলেছেন, 'বাঙালি হওয়ার সাথে ধর্মে মুসলমান থাকার কোনো বিরোধ নেই। একটি আমার ধর্ম, অন্যটি জাতি পরিচয়। ধর্ম আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচার। জাতি পরিচয় আমার সমষ্টিগত ঐতিহ্য।'

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক সমাবেশে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।' তিনি আরও বলেন, 'ইসলামের অবমাননা আমি চাই না।...এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে।...এখানে ধর্মের নামে ব্যাবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না।'

তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সব মানুষের নিজ নিজ ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনায় তাঁর আজীবন লালিত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন দেখা যায়। সেদিন তিনি স্বভাবসুলভ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার নিজ নিজ অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা করবও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না।' যা আল কোরআনের সূরা কাফেরুন-এর মূলকথা। বঙ্গবন্ধু যেমন একজন খাঁটি বাঙালি, তেমনই ছিলেন একজন ইমানদার মুসলমান।

ইসলামের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানগুলো হলো: তিনি স্বাধীনতা-উত্তর আলেম-ওলামার সমন্বয়ে মহানবি (সা.)-এর জীবন ও কর্ম জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য 'সিরাত মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সিরাত মজলিসের উদ্যোগে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে পবিত্র রবিউল আউয়ালে বৃহত্তর আঙ্গিকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উদ্‌যাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসাবে এই পবিত্র মিলাদুন্নবি (সা.) মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুই পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) পালনের পাশাপাশি শবেকদর এবং শবেবরাত উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন এবং উল্লিখিত দিনগুলোয় দেশের সব সিনেমা হলে সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে পাকিস্তানি শাসকরা মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে পারেনি এবং চায়ওনি। অথচ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে শাস্তির বিধান জারি করেন।

বঙ্গবন্ধু ইসলামি তাহজিব, তমদ্দুন সংরক্ষণে; দেশের সর্বত্র ইসলামের সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'কে পুনর্গঠন করেন। এর আগে মাদ্রাসা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত ছিল না, বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' নামকরণ করেন। তিনি জনগণের হৃদয়ে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করতে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তাফসিরের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা প্রচারের অনুমোদন দেন। তিনি দিবসের কর্মসূচি কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু এবং শেষ করার নির্দেশনা দেন, যা এখনো অব্যাহত আছে। তিনি বেতার-টেলিভিশনে আজান ও দোয়ার প্রচলন করেন। দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান যেন স্বল্পব্যয়ে পবিত্র হজ পালন করতে পারেন, সেজন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হজযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করেন। বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে সরকারি জমি বরাদ্দসহ কাকরাইলে মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ দেন। তিনি সর্বপ্রথম রাশিয়ায় ইসলাম প্রচারকদের একটি দল পাঠান। বঙ্গবন্ধু ইসলামের খেদমতে অনন্য অবদান রাখতে ১৯৭৪ সালে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানে যে বক্তব্য দেন তাতে ইসলাম ও বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা সমুন্নত হয়। তিনি ওআইসি সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পক্ষ সমর্থন করে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের জন্য ১ লাখ পাউন্ড চা এবং ২৮ সদস্যের মেডিক্যাল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী পাঠান।

অনিয়ম-অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিপরীতে বাঙালি সমাজকে ইসলামের সাম্য ও শান্তির সমাজের প্রতিচ্ছবি করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তমদ্দুন মজলিসসহ অন্যদের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা হিসাবে ইসলামি

আমরা লেবাসধারী ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হজরত রাসুলে কারিম (সা.)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র।

চেতনাবোধের প্রতি সহমত থাকা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কার হয়েও অন্যায় আদেশের সামনে মাথানত না করা, মুচলেকা ও জরিমানা না দেওয়া, আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদাবোধের ওপর অবিচল থাকা, সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে দেওয়া বিশেষ ভাষণে ও অন্যান্য সময়ে, 'কোরআনবিরোধী কোনো আইন করা হবে না' মর্মে ঘোষণা দেওয়া, কথাবার্তায় ও বক্তব্য-ভাষণে অনুপম ভঙ্গিতে 'ইনশাআল্লাহ' বলে ইসমে আজমের অসীম ক্ষমতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন, কওমি ঘরানার আলেমদের নিয়ে ভারতের 'দারুল উলুম দেওবন্দ' প্রকৃতির ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা এবং মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে ওআইসির সম্মেলনে অংশগ্রহণসহ নানাবিধ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর ইসলামবিষয়ক কীর্তি ও ধর্মীয় চেতনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তবে বাংলাদেশে ইসলামের জন্য চিরস্মরণীয় ও নজিরবিহীন যে কাজটি তিনি করেছেন সেটি হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও গবেষণা আর প্রকাশনার ক্ষেত্রে এটি সর্ববৃহৎ এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত।

১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাবলিও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়:

১. মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা;
২. মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া;
৩. সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের ওপর গবেষণা পরিচালনা;
৪. ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
৫. ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তা প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামি সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলোর সুলভ প্রকাশনা ও বিলিবণ্টনকে উৎসাহিত করা;
৬. ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার-পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;
৭. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;
৮. ইসলামবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;
৯. ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;
১০. ইসলামবিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা এবং
১১. বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধন করা।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসাবে নন্দিত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের বাংলা তরজমা, তাফসির, হাদিস গ্রন্থের অনুবাদ, রাসুল (সা.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি আইন ও দর্শন, ইসলামি অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহাবি ও মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ শুধু বাংলাদেশের পাঠকদের কাছেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান ঢাকায় প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, আর্তমানবতার সেবায় ২৮টি ইসলামিক মিশন, সাতটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বৃহত্তম কলেবরে ২৮ খণ্ডে ইসলামি বিশ্বকোষ, ১২ খণ্ডে সিরাত বিশ্বকোষ প্রকাশ করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ:

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা;
২. জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) পালন;
৩. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন;
৪. বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ;
৫. কাকরাইলের 'মারকাজ মসজিদ' সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ;
৬. হজ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা;
৭. ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.), শবেকদর, শবেবরাত উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং উল্লিখিত দিনগুলোয় সিনেমা হলে সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান;

৮. বেতার ও টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াত, আজান ও দোয়ার প্রচলন;
৯. মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান;
১০. রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধকরণ;
১১. রাশিয়ায় প্রথম তাবলিগ জামাত পাঠানোর ব্যবস্থা;
১২. আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরববিশ্বের পক্ষে সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ এবং
১৩. ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি।

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি বাঙালি মুসলমানদেরও মুক্তিদূত। তিনি দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, এর কোনো তুলনা হয় না। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে যে বিপুল অবদান রেখেছেন, গোটা বিশ্বে এর দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে মূলধারার ইসলামের সূচনা করেন।

তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে ১০১০টি দারুল আরকাম মাদ্রাসার কার্যক্রম চালু, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সনদের সরকারি স্বীকৃতি, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্যবর্ধন ও সম্প্রসারণ, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান, শিশু গণশিক্ষা ও কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থান, ইমাম, মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক হিফজ, কিরাত ও তাফসির প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন, অভিজ্ঞ মুফতিদের সমন্বয়ে ফতোয়া দানের বৈধতা প্রদান, করোনাকালে বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেওয়া, ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দেশে পবিত্র কোরআন অবমাননায় জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে তাঁর পিতার ইসলামি শিক্ষাপ্রীতিই অনুসরণ করছেন।

ইসলামি চেতনায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন অকৃত্রিম সমুজ্জ্বল। আর সেই পথ ধরেই এগোচ্ছেন তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করছেন। ইসলামের চেতনা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই নিবন্ধ রচনাকালে যেসব পুস্তক ও পত্রিকা পর্যালোচিত হয়েছে

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান;
২. শেখ মুজিব আমার পিতা, শেখ হাসিনা;
৩. মুজিব বাংলার বাংলা মুজিবের, শেখ হাসিনা;
৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম;
৫. ইতিহাসের ধারায় শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু, জাফর ওয়াজেদ;
৬. ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু, প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন;
৭. বঙ্গবন্ধু পূর্ণ জীবন, শেখ হাদী;
৮. স্বাধীনতার মহানায়ক, এম আর এ তাহা;
৯. বঙ্গবন্ধুসমগ্র, মুনতাসীর মামুন;
১০. নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু, সম্পাদনা রাজীব পারভেজ;
১১. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, প্রকৌশলী এসএম খাবীরুজ্জামান;
১২. বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা, ভবেশ রায়;
১৩. সাংবাদিকের স্মৃতিভাষ্যে বঙ্গবন্ধু, প্রকাশনা: পিআইবি;
১৪. বঙ্গবন্ধুর মর্মকথা, ড. এসএম জাহাঙ্গীর আলম;
১৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট;
১৬. ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার অবদান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহউদ্দিন, দেশ রূপান্তর, ৩১ জুলাই ২০২৩।

লেখক: পরিচালক (প্রশাসন), চলতি দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

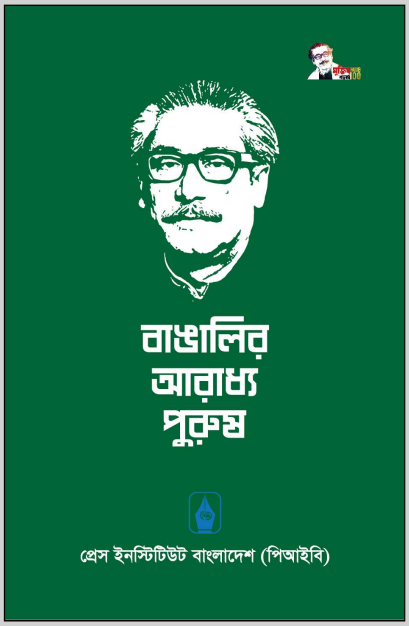

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর তিনটি গ্রন্থ এবং নতুন প্রজন্মের বহুমাত্রিক চেতনা

সালাম জুবায়ের

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির চরম ব্যস্ত ও প্রতিকূল সময়ের সওয়ারি হয়েও তাঁর জীবনের অনেক কিছু লিখে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর সেসব লেখা গ্রন্থনা করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের জন্য, এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থগুলো এখন আমাদের বিদগ্ধ পাঠক ও সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ ভূখণ্ডের অতীত রাজনীতি এবং মানুষের স্বাধীনতা ও জীবনমান উন্নয়নের সংগ্রামের দীর্ঘ পথযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা, বোঝা ও উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুর পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তিনটি গ্রন্থ। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', ২০১৭ সালে পাঠকের হাতে এসেছে 'কারাগারের রোজনামচা' এবং ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'আমার দেখা নয়াচীন'। বঙ্গবন্ধু তাঁর জেলজীবনের নানা সময়ে এসব লেখা কখনো ডায়ারি হিসাবে, কখনো তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অনুরোধে ঘটনাগুলো লিখে রেখেছিলেন। বলা সংগত যে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই বঙ্গবন্ধু এসব লেখা লিখতে শুরু করেছিলেন, তা না হলে আমরা আজ এসব মূল্যবান প্রকাশনা পড়ার সুযোগ পেতাম না।

বঙ্গবন্ধুর এসব লেখা পরিকল্পিত বলছি এ কারণে, বঙ্গবন্ধু নিজেই তা বলে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে বিভিন্ন ব্যক্তির উৎসাহ দেওয়া ও উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, "বন্ধু-বান্ধবরা বলে, তোমার জীবনী লেখো। সহকর্মীরা বলে, রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখো, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, 'বসেই তো আছ, লেখো তোমার জীবনের কাহিনি।' বললাম, লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি, যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো

কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।...হঠাৎ মনে হলো লিখতে ভালো না পারলেও ঘটনা যত দূর মনে আছে, লিখে রাখতে আপত্তি কী! সময় তো কিছু কাটবে। বই ও কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চোখ দুইটাও ব্যথা হয়ে যায়। তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম।...আমার স্ত্রী, যার ডাকনাম রেণু–আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।"

বঙ্গবন্ধুর লেখা তিনটি গ্রন্থ নতুন প্রজন্মের জন্য বহুমাত্রিক চেতনা এবং রাজনৈতিক আদর্শের উৎস। তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিক এবং অন্য পেশার তরুণদের অনেক কিছু শেখার এবং অনুধাবনের বিষয় রয়েছে এ তিন গ্রন্থে। এসব গ্রন্থ পাঠে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের পাঠ যেমন নেওয়া যায়, তেমনই ইতিহাসের আলোয় বঙ্গবন্ধু যেভাবে তাঁর সময়ের ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, তা জেনে নিজেদের রাজনীতি ও সমাজনীতির অতীত চেনা-জানা যায়। রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজেকে সময়ের সাহসী সন্তান হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সেই গড়ে ওঠার সময়কালকে তাঁর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব এ বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে।

এ উপমহাদেশের অনেক অজানা এবং অসাধারণ তথ্য ও বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ গ্রন্থ তিনটি। অন্যদিকে এ গ্রন্থগুলোতে সেই সময়ের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক বিষয় অত্যন্ত নির্মোহভাবে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি পেশাদারি লেখক ছিলেন না, ছিলেন রাজনীতিক। কিন্তু যে দক্ষতা নিয়ে তিনি তাঁর কথা লিখেছেন, তা একজন পেশাদার লেখকের মতোই হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর তিন গ্রন্থ সম্পর্কে দেশে এবং বিশ্বপরিসরে রাজনৈতিক মহলের জানা হয়ে গেছে। বিদেশে অন্য অনেক ভাষায় বইগুলোর অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। অসমাপ্ত আত্মজীবনী এ পর্যন্ত ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমিয়া, ইতালীয়, মালয়, কোরীয়, রুশ, মারাঠি, গ্রিক, থাই ও ত্রিপুরা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের বড়ো বড়ো গ্রন্থাগারে বইগুলো পড়তে পারছেন বিভিন্ন ভাষার পাঠক। এটা বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরবের ব্যাপার।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ সংগ্রাম, নিজ গ্রামে কাটানো শৈশব, কৈশোর ও কলকাতায় পড়াশোনা এবং যৌবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর পারিবারিক জীবন অবস্থা-পরিস্থিতি এবং সামাজিক জীবন কীভাবে কাটিয়েছেন, এর সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। পিতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং মায়ার সম্পর্ক ছিল, তা তিনি প্রাণস্পর্শী আবেগ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাজনৈতিক জীবন, কলকাতায় শিক্ষাগ্রহণের সময় মানুষের মধ্যে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং দাঙ্গা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মনোবেদনা জানিয়েছেন। ১৯৪৭-এ ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা–দেশবিভাগ নিয়েও বঙ্গবন্ধু তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়েছেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ভাষার বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট ভাষা আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণের কথাও উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধু। উল্লেখ করেছেন পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বাঙালিদের বাঁচার দাবি 'ছয় দফা'র নানা বিষয়ও।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত জোর দিয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাপারে। রাজনীতি হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের সেবা করার মাধ্যম। মানুষের সেবা করার মনোবৃত্তি নিয়েই তিনি রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন। সেই সময়ে উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে তিনি রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন। এছাড়া শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীর সঙ্গেও বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রেখেছেন।

সেই সময়ে দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করার মনোবৃত্তি নিয়েই তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শবাদী পিতা ও সহধর্মিণীর নানাভাবে উৎসাহদানের বিষয়টি উল্লেখ করতে ভোলেননি। বঙ্গবন্ধুর বাবা তাঁকে নিয়ে বলেছিলেন, 'দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দেব না।'

'কারাগারের রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধু তাঁর কারাজীবনের কথা তুলে ধরেছেন। উত্থাপিত ছয় দফার গুরুত্ব, ছয় দফা দাবি ঘোষণার পর এ নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নানামুখী ভাবনা ও কারাগারের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটি আসলে একটি ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনার দাবি রাখে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সাধারণ মানুষের বাঁচা-মরার লড়াইয়ের দাবি, জীবনমান উন্নয়নের দাবি তুলে ধরতে গিয়ে, সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে অসংখ্যবার সরকারের রোষানলে পড়েছেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে জেলে পুড়ে রাখতেই বেশি পছন্দ করত। জেলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শবোধ জাগ্রত হয়, সাধারণ মানুষকে নিয়ে ভাবার যে আকাঙ্ক্ষা আলো ছড়ায়, যে আবেগ-অনুভূতি তৈরি হয়, তা বঙ্গবন্ধু তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা'য় তুলে ধরেছেন। এ বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা জানার সুযোগ পাই সেই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনীতিকদের জেলজীবন এবং সর্বোপরি সেই সময়ে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন কীভাবে এবং কতটা প্রভাব ফেলেছিল তাদের মনে। যথার্থ কারণেই বইটি প্রকাশের পর রাজনৈতিক নেতা এবং সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে তুমুল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এর আগে জেলজীবন নিয়ে একাধিক রাজনৈতিক নেতা বই লিখেছেন। কিন্তু সেসব বইয়ে জেলজীবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কথাবার্তা বেশি বিধৃত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামচা'য় যতটা নিজের কথা বলেছেন, এর চেয়ে বেশি জানান দিয়েছেন সেই সময়ের কথা-পরিস্থিতি। একজন আদর্শবাদী রাজনীতিকের জন্য জেলজীবন অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। সাধারণ মানুষের ওপর সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক নির্যাতন-বৈষম্য রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু যেহেতু গণমুখী রাজনীতির ধারক-বাহক ছিলেন, তাই পাকিস্তান সরকার তাঁর ওপর চরম ক্ষিপ্ত ছিল। এ কারণে জীবনের দীর্ঘ সময় জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে। তিনি জেলে বসেই জেলের সেসব কাহিনি-ঘটনা লিখে রাখতে শুরু করেন। এই বইটিতে ১৯৬৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দি জীবনের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলজীবনের প্রকৃত চিত্র তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন। পুরো বইটি একজন রাজনীতিকের রাজনীতি সম্পর্কে নানা অভিমতে ঠাসা। ফলে রাজনীতিকদের বইটি অবশ্যপাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়।

'আমার দেখা নয়াচীন' মূলত চীন সফর করতে গিয়ে নতুন চীনকে কেমন দেখেছেন তার বর্ণনা। কিন্তু একে শুধু সফরনামা বা ভ্রমণকাহিনি বললে গ্রন্থটি সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। এ গ্রন্থের পাতায় পাতায়

রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজেকে সময়ের সাহসী সন্তান হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সেই গড়ে ওঠার সময়কালকে তাঁর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব এ বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে

বঙ্গবন্ধু চীন সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। চীন কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। সেই পর্যবেক্ষণই 'আমার দেখা নয়াচীন'। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার এক দশকের মধ্যে বঙ্গবন্ধু দুবার চীন সফর করেছেন। দুই সফরেই বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত অনুসন্ধানী মন নিয়ে চীনের নানা বিষয়–সরকার পরিচালনা, উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চীনের এগিয়ে যাওয়া–সবকিছু তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার পর্যবেক্ষণে অনুসন্ধিৎসা ছিল যেমন, তেমনই ছিল অভিজ্ঞতা অর্জন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করেছেন এ গ্রন্থে। এজন্যই গ্রন্থটিতে আমরা একজন রাজনীতিকের পর্যবেক্ষণ স্পৃহা দেখতে পাই। এটা সাধারণ মানের রাজনীতিকদের কাছে আশা করা যায় না।

বিশ্বের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের অনেকে তাঁদের জীবদ্দশায় রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের গ্রন্থের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর লেখা গ্রন্থের তুলনার সুযোগ নেই। কারণ, বঙ্গবন্ধুর জীবনসংগ্রাম, আত্মত্যাগ, আদর্শবাদিতা এবং জীবন-মরণ মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ব্যাপার তাদের অনেকেরই ছিল না। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থ তিনটি বিশ্বে আত্মজৈবনিক গ্রন্থ হিসাবে অত্যন্ত মর্যাদা ও পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতিকদের জন্য এ গ্রন্থগুলো আকরগ্রন্থ হিসাবে বেঁচে থাকবে।

যে কোনো ভালো এবং দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং লেখকের একটি বড়ো ভূমিকা থাকে। বিষয়বস্তু যে কোনো প্রজন্মের মানুষকে আকৃষ্ট করে গ্রন্থটি পড়ার দিকে টেনে আনতে পারে। আবার যদি লেখক হন জগদ্‌বিখ্যাত কেউ তবেও সে গ্রন্থ পড়তে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পৃথিবীতে এমন দুই ধরনের গ্রন্থেরই লাখ লাখ পাঠকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাসে এমন অনেক নজির আছে। যারা গ্রন্থ প্রকাশ এবং বিপণনের সঙ্গে যুক্ত তারা জানেন গ্রন্থের পাঠকপ্রিয়তার এসব সুলুক সন্ধান। গ্রন্থের পাঠকপ্রিয় হওয়ার এসব সমীকরণ মাথায় রেখে বিবেচনা করলে বঙ্গবন্ধুর তিনটি গ্রন্থ কেন এবং কীভাবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে গেল তার রহস্য বোঝা যাবে। রুচিশীল এবং বিদগ্ধ পাঠকমাত্রই মনোযোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর তিনটি গ্রন্থ পাঠ করে তাদের প্রতিক্রিয়া বা অভিমত যাই বলি না কেন, তারা তা প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্র ঘাঁটলে পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানা যাবে। তাতে দেখা যায়, পাঠকরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়েছেন। তাদের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ–এমনটাই জানিয়েছেন তারা।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে একান্ত নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন। নতুন প্রজন্মের অনেকেরই এখনো হয়তো জানা হয়ে ওঠেনি যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূল্যবান সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নে আপসমূলক ভূমিকা গ্রহণ করলে হয়তো এভাবে জেলের দুঃসহ জীবন সইতে হতো না। কিন্তু দেশের মানুষের সঙ্গে বেইমানি করে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রে আপস করতে শেখেননি। এজন্য তাঁর জীবনে বারবার দুঃসহ ও নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে এসেছিল। তবে তিনি কখনো আপস করেননি। ফাঁসির দড়িকেও ভয় করেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালে, তখন এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন ঝেঁকে বসেছিল। হাজার মাইল দূর থেকে বাণিজ্য করতে এসে ব্রিটিশ বেনিয়ারা শাসক হয়ে উঠেছিল। অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে ক্ষমতায় আসে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) পাকিস্তানিরা শুরু থেকেই বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। ফলে পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশে হয়ে উঠেছিল জনবিচ্ছিন্ন শাসক। ফলে বাংলাদেশের মানুষকে আবার শোষণ মুক্তির জন্য আন্দোলন নিয়ে পথে নামতে হয়। আর পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কীভাবে বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেছেন তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের অনেক সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি ছিলেন। এ সময়ে বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং সহধর্মিণীর অনুপ্রেরণায় তিনি জীবনী লেখা শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দখলে ছিল। এ বাড়িতেই একটি ড্রেসিংরুমের আলমারির ওপরে অন্যান্য খাতাপত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা এই আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ডায়ারি, ভ্রমণকাহিনিও ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী সমগ্র বাড়িটি লুটপাট ও ভাঙচুর করলেও এই কাগজপত্রগুলোকে মূল্যহীন ভেবে অক্ষত রেখে যায়।

পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িটি জিয়া সরকার কর্তৃক সিলগালা করে দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে বাড়িটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ওই বাড়িতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকথা, ডায়ারি ও চীন ভ্রমণের খাতাগুলো খুঁজে পাওয়া গেলেও তাঁর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়নি। শুধু কয়েকটি ছেঁড়া-উইপোকায় কাটা টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজ পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন পর ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধুর এক ভাগনে অতি পুরোনো-জীর্ণপ্রায় এবং প্রায়ই অস্পষ্ট লেখার চারটি খাতা শেখ হাসিনাকে এনে দেন। তিনি এই খাতা চারটি বঙ্গবন্ধুর আরেক ভাগনে শেখ ফজলুল হক মণির অফিসের টেবিলের ড্রয়ার থেকে সংগ্রহ করেন। অনুমান করা হয়, শেখ মণিকে টাইপ করার জন্য এগুলো দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরে এগুলো বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে অসমাপ্ত আত্মজীবনী নামে ২০১২ সালের জুনে প্রকাশ করা হয়।

কারাগারের রোজনামচায় বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন, জেলযন্ত্রণা, কয়েদিদের অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধ জগতে পা দিয়েছিল, তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা, গণমাধ্যমের অবস্থা, শাসক গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন, ছয় দফার আবেগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রকৃতিপ্রেম, পিতৃ-মাতৃভক্তি, কারাগারে পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না--এমন অনেক অজানা তথ্য বঙ্গবন্ধু বইয়ে তুলে ধরেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক খ্যাতিমান নেতা দীপ্যমান ছিলেন, ছিলেন অনেক জনপ্রিয় নেতাও। কিন্তু তাঁরা অনেক কিছু পারেননি যা বঙ্গবন্ধু করে দেখিয়েছেন

'আমার দেখা নয়াচীন'-এ বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৯৫২ সালে গণচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবরে গণচীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে ৩২ বছর বয়সি বঙ্গবন্ধু ছাড়াও আতাউর রহমান, মানিক মিয়া, খন্দকার মো. ইলিয়াসসহ বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন। সেটি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রথম চীন সফর। এই সফরে চীনের অবিসংবাদিত নেতা মাও সে তুং-এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা হয়। এ সময় খুব কাছ থেকে তিনি চীনের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়াও ১৯৫৭ সালে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালে পাকিস্তান সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে তিনি দ্বিতীয়বার চীন ভ্রমণ করেন। বঙ্গবন্ধু তার লেখায় চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক অবস্থার তুলনা এবং সাম্যবাদী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা কীভাবে হচ্ছে, তা নিয়ে তার নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক-সামাজিক নেতা এবং বিশ্লেষক হিসাবে অত্যন্ত চিন্তাশীল, মেধাবী এবং দূরদর্শী ছিলেন, তা তার তিনটি গ্রন্থ পড়তে পড়তে সব পাঠক অনুধাবন করবেন--এটা বলায় অতিরঞ্জন নেই। বাস্তবতা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে এবং নীতি-আদর্শের প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব তাকে এদেশের বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর একটি ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল। এর ফল তিনি পেয়েছেন দেশের সব মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জনের মধ্য দিয়ে। এটা তার সময়কালের অন্য রাজনীতিকদের বেলায় তেমনভাবে অর্জিত হয়নি। আর এখানেই নতুন প্রজন্মের জীবনে রাজনৈতিক বলি বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলি, নীতি-আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলার শিক্ষা-অনুপ্রেরণা নেওয়ার অনেক কিছু আছে।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক খ্যাতিমান নেতা দীপ্যমান ছিলেন, ছিলেন অনেক জনপ্রিয় নেতাও। কিন্তু তাঁরা অনেক কিছু পারেননি যা বঙ্গবন্ধু করে দেখিয়েছেন। মানুষের জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজের যে অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা কেন অন্যদের বেলায় হয়নি, যাদের অনেকে ছিলেন বঙ্গবন্ধুরও নেতা। এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে বঙ্গবন্ধুর লেখা তিন বইয়ে চোখ রাখলে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য যে, তিনি সম্পূর্ণ একক নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তর্জনী উঁচিয়ে বাংলার মানুষকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা-ই আপামরসাধারণ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছেন। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষুকে কখনো পরোয়া করেননি, ছেড়ে কথা বলেননি। জেলের পাশে কবর খুঁড়ে ভয় দেখালেও বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ থেকে টলেননি। এভাবে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে রাজনীতি করা মানুষ পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার জন্ম হয়নি। বঙ্গবন্ধুর পর্বতসম ব্যক্তিত্ব-নেতৃত্বের কথা জেনে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি; কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখেছি। অর্থাৎ কাস্ত্রো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হিমালয় পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের মতো আরও অনেক বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে আলোকিত-সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর জীবনের কৈশোর-যৌবনকাল ছিল এসব সাফল্য অর্জনের প্রস্তুতিপর্ব। আর আমাদের সৌভাগ্য যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই প্রস্তুতিপর্বের অনেক ঘটনা লিখে রেখে গেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর সেসব লেখা থেকে শক্তি, অনুপ্রেরণা, সাহস সঞ্চয় এবং শিক্ষা নিয়ে আমাদের যেমন, তেমনই নবীন প্রজন্মকে গড়ে তোলার পথ সৃষ্টি করা। বঙ্গবন্ধুর লেখা গ্রন্থ পড়তে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র

জাফর ওয়াজেদ

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। অর্থ, খাদ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগব্যবস্থা অপ্রতুল ও ভঙ্গুর। শহিদ-পরিবারের আর্তনাদ এবং হত্যার বিচার দাবি, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত আনার চাপ, যুদ্ধাপরাধী দালালসহ রাজাকারদের বিচারের আনুষ্ঠানিকতা মিলিয়ে এক করুণ ও কঠিন অবস্থানে তখন বাংলাদেশ। পাকিস্তানি হানাদাররা সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। সোনাদানা, ব্যাংকের টাকাকড়ি যেমন অবাধে লুট করে নিয়েছে, তেমনই ধ্বংস করে দিয়ে গেছে অমূল্য সব সম্পদ। পরাজিত শক্তির হাতে তখনও অস্ত্রশস্ত্র। পলাতক অবস্থান থেকে ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এক জটিল অনতিক্রান্ত বৃত্ত থেকে দেশকে আবার গড়ে তোলার দুঃসাধ্য কাজটি বঙ্গবন্ধুকে একাই করতে হয়েছে। বিদেশি সাহায্য অপ্রতুল। স্বীকৃতিদাতা দেশের সংখ্যা বাড়লেও সহায়তা তেমন মেলেনি। পাকিস্তানি হানাদারদের মদতদাতা দেশগুলো বাংলাদেশ বিরোধিতায় একাট্টা। খাদ্যবাহী জাহাজ পর্যন্ত দেশে আসতে দেয়নি। এক দুঃসহ সময়ের পরিধিতে সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছে তিন বছর সময় চেয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দেশকে গড়ে তুলে সোনার বাংলার প্রত্যয়কে সামনে এনেছিলেন। সাড়ে তিন বছরের মাথায় তিনি দেশকে গড়ে তোলা শুধু নয়, উন্নয়নের রথকে চালিতও করেছিলেন। বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রভূমিকে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি এগিয়ে নিয়েছিলেন। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–সবখানেই বঙ্গবন্ধু সৃজনের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত করেছিলেন। যার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় স্থান করে নেওয়ার পথপরিক্রমায় সমুন্নত হতে পেরেছিল। নতুন করে সেতু, কালভার্ট, বন্দর, গুদাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া দেশ সমৃদ্ধির পথে উন্নয়নের রথে যখন বহমান, তখনই আঘাত আসে। পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশি-বিদেশি দোসররা ষড়যন্ত্রের যে বীজ যুদ্ধপরবর্তীকালে বপন করে, তা বিকশিত হয়ে বাংলাদেশকে পর্যুদস্ত করার ব্রতে হত্যা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে। দেশ আবার পাকিস্তানি ধারাকে ধারণ করে। সামরিক জান্তা শাসকরা স্বাধীনতার

অর্জিত সুফলকে মুছে ফেলা শুধু নয়, ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করে বাংলাদেশকে একটি দরিদ্র, হতশ্রী দেশে এবং বাঙালিকে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করে। যাতে দেশ ও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। স্বাধীনতার পূর্বাপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রমাণিত হয়–একশ্রেণির রাজনীতিকরা হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিল।

দেশ যখন ছিল ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তানি উপনিবেশ, তখন দেশের মানুষ সবাই ছিল স্বদেশ অন্তঃপ্রাণ। যেন দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান হতে পারে–এই কামনা, প্রার্থনা, বাসনা ছিল। আর ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি উপনিবেশের শিকার বঙ্গদেশ হয়ে পড়ে হতশ্রী, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এক অঞ্চল। যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া দেশকে আপন করে তোলার কাজটি তো আর সহজ ছিল না। বরং স্বাধীন স্বদেশ পেয়ে দেশটাকে নিকুচি করার কাজে লোকের কমতি ছিল না।

স্বাধীন হওয়ার আগে বলা হতো, দীন-দুঃখিনী মা যে মোদের, এর বেশি তার সাধ্য নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর আর তর সয়নি। সমস্বরে যেন বলা হয়–তোমার সাধ্যে কুলোক আর না কুলোক, তোমার ভাঁড়ারে কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমাদের দাবি আগেভাগে মিটিয়ে দিতে হবে। 'জয় বাংলা' ধ্বনির মর্যাদা ভুলে গিয়ে দেখা গেছে, 'লুটেপুটে খাইখাই' স্বভাবটা সামনে এসে হাজির হয়েছে কারও কারও। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটা যে গড়ে তুলতে হবে এবং এই তোলার মধ্যেই যে রয়েছে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য, লাখ লাখ মানুষের আত্মদানের মহিমা প্রতিষ্ঠা এবং মা-বোনদের সম্ভ্রমহানির গ্লানি মুছে ফেলা। কিন্তু নিজ দেশটাকে 'ভাগাড়ে' বানাতে কম কসুর করেনি একদল উঠতি সশস্ত্রজন।

অস্ত্রের ঝনৎকার তখন চারদিকে। সেই অস্ত্র নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি লুট, অস্ত্র লুট, শ্রেণিশত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা শুধু নয়–জনপ্রতিনিধিদের প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটেছে। মোদ্দা কথা, পরাধীনতাকে, উপনিবেশকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সশস্ত্র যুদ্ধে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরাধীনতা যেমন অসহনীয়, অবাঞ্ছনীয়; স্বাধীনতা যে আবার তেমনই মহামূল্যধন, সে কথাটি মনে-প্রাণে অনুভব করেনি। খুব হালকাভাবে নিয়েছে। ভেবেছে–দুঃখের দিন গেল, সুখের দিন এলো। অনেক কষ্ট করেছে, এখন আরাম করবে। অনেক ত্যাগ করেছে, এখন ভোগ করবে। এতদিন দাসত্ব করেছে, এখন প্রভুত্ব করবে। আর এখানেই হয়েছে মারাত্মক ভুল। পরাধীনতার পাপ বিদায় করতে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, স্বাধীনতার পুণ্যফল ভোগ করতেও আবার তেমনই কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন রয়েছে, তা বেমালুম ভুলে গেছে। যেমন ভুলেছে দেশের কাজে আনন্দ আছে, আরাম নেই। দেশপ্রেম 'রজকিনী প্রেমের মতো নিকষিত হেম, স্বার্থ গন্ধ নাহিক তায়'। কিন্তু 'যুদ্ধ শেষে প্রাপ্য চাই' বলে যারা হুলুস্থুল করেছিল, তারা বুঝতেই পারেনি দেশপ্রেম শুধু যুদ্ধজয় নয়, যুদ্ধশেষের ধ্বংসস্তূপে নতুন জীবন গড়ে তোলাও। দেশসেবার কোনো দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করতে পারেনি।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি যে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি, বরং বীরদর্পে শক্তি সঞ্চয় করে আবার সশস্ত্র হয়ে ফিরে আসবে, নেবে পরাজয়ের প্রতিশোধ; সেই বোধ কারও মনে ঠাঁই পেয়েছে তা নয়। বরং একাত্তরে গণহত্যাকারী পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগী বাঙালি চরদের বিচারকাজেও বাধা আসে গোড়াতে। দালাল আইন বাতিল করার জন্য নেতা মওলানা ভাসানীও মাঠ গরম করে তুলেছিলেন শুধু নয়, অনশন কর্মসূচিও পালন করেছেন। স্বাধীনতাকে মেনে নিতে না পারা চরমপন্থিরা সর্বত্র সশস্ত্র মহড়া দিয়ে লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ বহাল রাখে। কিন্তু যুদ্ধজয়ী কারও মনে এমন বোধোদয় হয়েছে যে, পরাজিত শক্তির কোনো চিহ্ন রাখতে নেই, তা নয়। বরং শত্রুদের আশ্রয় দিয়েছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়। ওরা আবার সংগঠিত হয়েছে নানারূপে, নানা কায়দায়। পাশাপাশি যাদের দৌলতে স্বাধীনতা লাভ, তাদের যথোচিত মর্যাদা দিতে দেওয়া হয়নি। তাদের পুনর্বাসন বা দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করতে দেওয়া হয়নি। গ্রামের যে যুবকটি কোনোদিন সাধারণ রাইফেল বা বন্দুক দেখেনি, তার হাতে যখন স্টেনগান, এসএমজি, এলএমজি উঠে আসে; তখন তার জীবনচেতনা বদলে যেতে বাধ্য। একাত্তর তার মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল, যুদ্ধোত্তর দেশে সে আগুন নিভিয়ে দিয়ে তাকে বনসাইয়ে পরিণত করার প্রচেষ্টা হিতে বিপরীত হয়েছে। ফলে স্বাধীনতাকে যতখানি মর্যাদা দেওয়ার কথা, তাও দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর দেশময় বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, খুনখারাবি, চোরাকারবারি, মজুতদারি–সবকিছু চলেছে অবাধে। তাই বঙ্গবন্ধুকে মজুতদার ও চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে বলতে হয়েছে, এদের নির্মূল করতে হবে। দুর্বৃত্তরা ততদিনে আশ্রয় নিয়েছে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলে।

বিরোধীরা জানত, তাদের এসব অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেবে তাদের দলীয় নেতারা, যদি অন্যায়কারীও দলের লোক হয়। যে কোনো কাজেরই সমর্থন পেয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছে। এমনকি এরা স্বাধীনতাসংগ্রামে ও যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের কাছেও আশ্রিত হয়েছে। দেশের স্বার্থ ততদিনে গৌণ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ সামনে চলে আসায় সমাজের শৃঙ্খল ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। যুদ্ধে ভঙ্গুর রাষ্ট্রযন্ত্রকে গড়ে তোলার কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বরং যে কোনো অপকর্মের অপরাধ থেকে মুরুব্বির জোরে রেহাই পেয়েছে। এরই ফলে সমাজের সব বাঁধন শিথিল হতে থাকে। সমাজ বলতে দেশের জীবন। সেই জীবনের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ। সেই চরিত্রটির অবস্থা এমন ক্ষণভঙ্গুর হতে থাকে যে, গোটা দেশটিকে আইনের শাসনের আওতায় আনার পথে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে থাকে। প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও সাহসী মানুষের অভাব ছিল তীব্র। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ও না নেওয়াদের মধ্যে একধরনের স্নায়বিক সংঘাত দেখা দেয়। স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি বহুধাবিভক্ত হতে থাকে। আর পরাজিতরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে নিজস্ব বিবেককে মুছে ফেলে। জাতীয় চরিত্রটির মধ্যে ভাঙন ধরেছে বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে সহস্র প্রতিকূলতার ভেতর গড়ে তোলার কাজটি এককভাবে করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই। নানা চিন্তা-চেতনায়, নানা মতবাদে আপ্লুতদেরও তিনি কাছে টানতে চেয়েছেন। পাকিস্তানি যুগের বিভেদকে ভুলে বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রটি গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি ছিল উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেশে-বিদেশে নানা ফ্রন্টকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। দেশে দলের একটা প্রাগ্রসর অংশ বেরিয়ে সশস্ত্র পন্থায় ধাবিত হয়। তারা খাদ্য ও পাটগুদাম, কারখানায় অগ্নিসংযোগ; থানা-ফাঁড়িতে হামলা, অস্ত্র লুট এবং হত্যাযজ্ঞ চালায় বিপ্লবের নামে। মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী চীনের অনুসারী চরমপন্থিরা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের নামে সাধারণ কৃষক থেকে সংসদ সদস্য পর্যন্ত হত্যা করে। গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করা ছাড়াও পুলিশ এবং থানা আক্রমণ ও লুটপাট চালাত। সারা দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে আতঙ্ক ছড়ায়। এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার মতো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যখন গড়ে তোলা হচ্ছে, তাদের ওপর আক্রমণটা এমনই তীব্র হয় যে দুর্গম অঞ্চলগুলো সশস্ত্র চরমপন্থিদের অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে। বিধ্বস্ত যোগাযোগব্যবস্থা, পর্যাপ্ত যানবাহন ঘাটতি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকা ইত্যাকার নানা সমস্যাক্রান্ত তখন পুলিশবাহিনী। যে বাহিনীর ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরেই হামলা চালিয়েছিল, সেই পথ

বঙ্গবন্ধু দেশগড়ার কাজে ডাক দিয়েছিলেন। অনেক আকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছিলেন। দেশটি গড়ার জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন প্রবল প্রতিকূলতায়। দেশকে একটি জায়গায় এনে স্থিতিশীল করে তোলার প্রক্রিয়ায় অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন

ধরে গণবাহিনী, সর্বহারাসহ চরমপন্থিরাও স্বাধীনতার পরপরই পুলিশবাহিনীকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত শুধু নয়, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

দেশকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রটি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। পরাজিত পাকিস্তানের থাবা তখনও বিদ্যমান। চীনপন্থিরা হয়ে ওঠে পাকিস্তানিদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র পূরণ এবং বাস্তবায়নের বাহন। বঙ্গবন্ধুকে এসব মোকাবিলা করতে হয়েছে ভঙ্গুর প্রশাসন দিয়ে। সেদিন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ দেশগড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে আসেনি। বরং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরোধিতায় আদাজল খেয়ে লেগেছিল। অপপ্রচারের মাত্রা ছিল তীব্র। এই গোষ্ঠীটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করে পাকিস্তানি হানাদার শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ শুধু নয়, তাদের নির্দেশ মেনে চলেছিল। শেখ মুজিবের নামে এবং নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক–এমনটা চায়নি যারা, তারা স্বাধীনতার পরও বিরোধিতা করেছে। অনেকে অদ্যাবধি নিহত বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদ্‌গার চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে বিশুদ্ধ বাঙালিরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। স্বার্থের সংঘাত ছিল না। স্বার্থ ছিল দেশকে স্বাধীন করা, হানাদারমুক্ত করা এবং বাঙালির শাসন প্রতিষ্ঠিত করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা। কিন্তু যেই না স্বাধীন হলো, অমনি স্ব-স্ব সম্পর্কের স্বার্থ এমন মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল যে, পরাজিত শক্তিরা হালে পানি পেল। অর্থ, অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তারা নানাভাবে নানারূপে এগিয়ে আসতে থাকে। তাদের তৎপরতা গড়াতে গড়াতে বঙ্গবন্ধুর দলের ভেতরও অবস্থান নিতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু দেশগড়ার কাজে ডাক দিয়েছিলেন। অনেক আকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছিলেন। দেশটি গড়ার জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন প্রবল প্রতিকূলতায়। দেশকে একটি জায়গায় এনে স্থিতিশীল করে তোলার প্রক্রিয়ায় অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির পিতা, তাই সব মানুষের প্রতি ছিল মমত্ববোধ। বিশেষত সাধারণ মানুষের প্রতি–যাদের জন্য তিনি নিজের জীবন, যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। বিভেদ, পরশ্রীকাতরতা ভুলে সোনার বাংলা গঠন করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন, তার বিকাশমান পর্যায়ে নিষ্ঠুর আঘাতটি হানা হয়েছিল। যে সংহতি বঙ্গবন্ধু সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাকে সংহার করা হলো। দেশ ফিরে গেল একাত্তর-পূর্ব পর্বে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ এবং পরে সমর্থিত দল বাকশাল নেতাকর্মীরা এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যখন বঙ্গভবনে শপথ নিচ্ছে বঙ্গবন্ধুরই মন্ত্রিসভার সদস্যদের একটা বড়ো অংশ, তখন আরেক অংশকে ক্রমশ কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান হলে বাকশালের মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার কথা নয়, আইয়ুব স্টাইলে উর্দিওয়ালারাই ক্ষমতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতেন।

সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য রাজনীতিকদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতায় আসীন করে তাদের মতাবলম্বীদের। সংবিধান ও সংসদ তখনও বহাল। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে পদটিতে দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি সংবিধানেই নির্ধারিত। সংসদ সদস্যরা ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ দখল করার বিরোধিতায় একাট্টা হয়নি। স্পিকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সংসদ ডেকে পদক্ষেপ নিতে পারতেন কি না, সে প্রশ্ন আজও অবান্তর নয়। সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা পালন করেছে, তা নয়। কেন পারেনি, কেন দায়িত্বে অবহেলা করেছে, সেসব আজও অনুদ্‌ঘাটিত। সেসময় ঢাকায় দলের প্রায় সব সংসদ সদস্য, প্রশিক্ষণরত বাকশালের জেলা গভর্নর, দলের কেন্দ্রীয় নেতারা অবস্থান করছিলেন। ছাত্রনেতারা ব্যস্ত ছিলেন ১৫ই আগস্ট সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজনে। সেদিন হরতাল ডাকা হয়েছিল সশস্ত্র একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। শহরে বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে। একধরনের আতঙ্ক ১৪ই আগস্ট দিনে-রাতে তৈরি করা হয়। নগরবাসীর ওপর মানসিক চাপ আগেই তৈরি করা হয়। সমাবর্তনে যোগদানকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও সে রাতের ঘটনা প্রমাণ করে না নিরাপত্তাব্যবস্থা সামান্যতম হলেও ছিল। হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আগের সময়গুলোয় কারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন, কারা বঙ্গবন্ধুর তথ্য পাচার করত–সেসব অজানাই থেকে গেছে। দলের ভেতর নানা উপদল, গ্রুপ, উপগ্রুপগুলোর তৎপরতা-অপতৎপরতার ভেতর বঙ্গবন্ধু বিদ্বেষমাত্রা কতটা ছিল, তা অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রয়োজন ছিল, সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থান রয়ে গেছে অজ্ঞাত। তারও নেপথ্য-প্রকাশ্য কারণ রয়েছে।

সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে বা সামান্যতম হলেও পালন করেছিলেন, এমনটা জানা যায় না। বরং ঘাতকরা যে বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধুকে 'খুনি, ডিকটেটর, সম্পদ লুটেরা' ইত্যাকার

বানোয়াট অভিধা দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল; তাতে ভয়ার্ত, আতঙ্কিত হওয়ার কী কারণ ছিল বাকশাল নেতা, সংসদ সদস্যদের? প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যর্থতার কথা আংশিক হলেও সর্বজনবিদিত। কিন্তু রাজনীতিকদের ভূমিকা ও অবস্থান দেখে বিস্মিত হতে হয়েছে সেদিন। বঙ্গবন্ধু নেই জেনে শোকাহত সাধারণ মানুষকে সেদিন শক্তিতে পরিণত করে দেশকে পাকিস্তানপন্থিদের হাতে চলে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেননি তারা। সরকারি দলের নেতাদের অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল এই ধারণা জন্মেছিল যে–বঙ্গবন্ধু নেই, তাতে কী হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারাই তো ক্ষমতায়। অনেকে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অথচ মুজিববিরোধিতা দিয়েই মোশতাক এবং তার সেনা-সহযোগী জিয়ার অবস্থান গ্রহণ। মোশতাক ক্ষমতায় বসে বঙ্গবন্ধু প্রণীত সব ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করে পাকিস্তানি বিধিবিধান চালু করে। পাশাপাশি জাতীয় চার নেতাসহ অন্যান্য নেতা, যাঁরা তার আনুগত্য মেনে নেননি, তাঁদের কারাগারে পাঠায়। মোশতাক যখন বুঝতে পারে আওয়ামী লীগ নেতানির্ভর দল নয়, কর্মীনির্ভর দল; তখন সারা দেশে কর্মীদের তার পক্ষে টানার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর জেলা ও থানা পর্যায়ে তার বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার ও মামলার ভয় দেখিয়ে কাউকে কাউকে অনুগত করে। অনেককে জেলে পাঠায়। অস্ত্র উদ্ধারের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘরে তল্লাশি চালানো হয়। প্রশাসনে পাকিস্তানপন্থি আমলাদের বসানো হয়।

মোশতাক খুব স্বল্প সময়ে এবং দ্রুত তার কার্য সমাধা করে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পেরেছিল ৮৩ দিনের ক্ষমতা দখলকালে। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, হাজী দানেশ, মওলানা তর্কবাগীশ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠন তার প্রতি সমর্থন জানায়। অনেক সংসদ সদস্য বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদ্‌গার করে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিল। মোশতাক পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়, কট্টর বামপন্থি ও স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের উন্মুক্ত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা করে। পাকিস্তানিদের পক্ষে দালালির অভিযোগে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মের প্রাধান্য দান, কালোটাকা বৈধকরণসহ অবাধ বাণিজ্যব্যবস্থা চালু, বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্তির কাজটি দ্রুত সেরেছিল। দেশজুড়ে তার এবং খুনি সেনাকর্মকর্তা ফারুক-রশীদ-ডালিমের প্রহরায় পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়নি। তার প্রতি বিরূপ আওয়ামী লীগারদের বিচার করার জন্য মোশতাক দুটি সামরিক আদালত গঠন করে। অস্ত্র উদ্ধারের নামে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করায়।

৬১টি জেলা গঠনের আদেশ বাতিল করে ১৯টি জেলা বহাল করা হয়। একপর্যায়ে সব রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। কিন্তু মোশতাক ও তার অনুসারীরা নিজস্ব রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ভাসানী ন্যাপ পুনর্গঠিত হয়। দালাল আইনে আটক তাদের নেতা যাদুমিয়া ছাড়া পেয়ে পাকিস্তানি ধারা চালু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সমন্বয়ে ক্ষমতা দখলকারীদের কেউই তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তাদের মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত শোনা যায়নি। দলের নেতাকর্মীদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়ছিল। কাউকেই আর বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না।

দেশের মানুষ এমন একটা ধাক্কা খেয়েছে ১৫ই আগস্ট, তারা নির্বিকার, ভাবালুতাহীন হয়ে পড়েছিল। শোকের, বেদনার মাত্রা খুব তীব্র ছিল বলেই ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও দাঁড়াতে পারেনি। সেদিন কেউ জনগণকে খুনিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে ডাক দেয়নি। যাদের দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করা, তারাই খুনিদের প্রতি, মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্যে শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশ নামক তাঁর সৃষ্ট রাষ্ট্রটাকেও হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বাপর। ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা সফল হয়েছে। শেখ হাসিনাকেও ২১ বার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পেছনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন তাঁর সৃষ্ট দেশটাকে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে, যাতে দেশ ও দেশবাসী ফিরে পায় সেই স্বদেশ।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

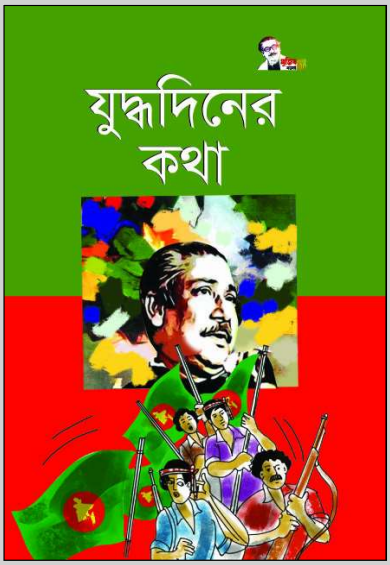

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)